রাতের বিভীষিকা

অরুণ কুমার দত্ত

অনন্য প্রকাশন ৬৬ কলেজ স্ট্রীট (দ্বিতল)
কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী—১৯৫৩, প্রকাশক হীরক রায় অনন্য প্রকাশন
৬৬, কলেজ স্ট্রীট (বিতল) কলিকাতা-৭৩ মুদ্রাকর বঙ্কিম চন্দ্র পাল—
নিউ পাল প্রেস ৬৭/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-৬,
প্রচ্ছদ ধীরেন শাসমল

ভূমিকা

রহস্য ও রোমাঞ্চ গল্পগুলোর একটা আলাদা আবেদন আছে। বাংলা ভাষায় রহস্য ও রোমাঞ্চকর পটভূমিকায় অনেক গল্প, অনেক উপন্যাস লেখা হয়েছে, ভবিষ্যতে আরও হবে। ঘাত প্রতিঘাতময় সংঘাতপূর্ণ কাহিনীগুলোর ভেতর একটা আকর্ষণ থাকে। পাঠকদের কাছে সাসপেন্সে ভরা রহস্য কাহিনীর এই আকর্ষণটাই মুখ্য উপজীব্য। পাঠক পাঠিকাদের এই চাহিদা, যে লেখক যত মুন্সিয়ানার সঙ্গে মেটাতে পারেন, পাঠকদের কাছে সেই লেখকের দাম তত বেশী।

এই বই এ তিনটে রহস্য কাহিনী সংকলিত হয়েছে। উপন্যাসগুলি তিনটে রহস্য কাহিনীই বিজ্ঞানাশ্রিত। বিজ্ঞানের তথ্য বিশ্লেষণ করে, রহস্য কাহিনীগুলো মোড়া রয়েছে। এই তিনটে রহস্যোপন্যাসই আগে, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে গেছে। সেগুলো একসঙ্গে করে বই-এর আকারে প্রকাশিত হ'ল। যারা বিজ্ঞানাশ্রিত রহস্যোপন্যাস পড়তে ভালবাসেন, আশা করি তাদের এই বই পড়তে ভাল লাগবে।

বইটা লেখার জন্যে কেয়া মিত্র, সোমা গণ ও বিনায়ক মুখোপাধ্যায় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এজন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই। আর ধন্যবাদ জানাই প্রকাশক ও প্রকাশনীর সংশ্লিষ্ট কর্মীদের।

শ্রীমতী শিপ্রা দত্ত

সূচীপত্র

বরিয়ারপুর স্টেশনটা ছাড়তেই ট্রেনটা স্পিড নিল। আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসের ফার্স্টক্লাশ কামরায়-একলা বসেছিলেন ডাঃ চপল ব্যানার্জী। তাঁর গন্তব্যস্থল জামালপুর শহর।

ডাঃ ব্যানার্জী আজ বছর খানেক হল জামালপুর ও মুঙ্গের শহরের মাঝামাঝি জায়গায় সোফিয়াবাদে তাঁর নতুন সাজারী খুলেছেন। প্রায় এক বিঘে জমি কিনে সেখানে একটা নার্সিংহোমও করেছেন। খুব সস্তাতেই জমিটা পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নার্সিংহোমটার নাম দিয়েছিন 'পূর্বাশা নার্সিংহোম।'

ট্রেনটা রতনপুর স্টেশন অতিক্রম করে গেল। সেখানে থামল না। প্রায় দশটা বাজে! কব্জি ঘুরিয়ে হাত ঘড়িটা দেখলেন ডাঃ ব্যানার্জী। ট্রেনটা প্রায় এক ঘণ্টা লেট চলছে। শরতের শেষ। বাইরে গনগনে রোদ উঠেছে। পূর্বাশা থাকলে বলত পুজো পুজো রোদ।

ট্রেনের কামরা থেকে বাইরের দিকে তাকালেন একবার ডাঃ চপল ব্যানার্জী। দুপাশে ধান ও অড়হরের ক্ষেত, ছবির মত মিলিয়ে যাচ্ছে। পুব দিকের দৃষ্টি পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে জামালপুরের পাহাড়। তার গায়ের সান্নিবিষ্ট গাছগুলো ক্রমশঃ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

···হঠাৎ কামরার মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। লাইটগুলো জ্বলে উঠল। ডাঃ ব্যানার্জী বুঝলেন ট্রেনটা এখন ফুটো পাহাড়ে ঢুকেছে। ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ফুটো করে টানেল তৈরী করেছিল ইংরাজ শাসকেরা। জামালপুরের সীমানা এখান থেকেই হল শুরু।

ডাঃ ব্যানার্জী কিন্তু জামালপুরের লোক নন। মাত্র একবছর হল জামালপুরের বাসিন্দা হয়েছেন। এই একবছর প্র্যাকটিশ করেই বেশ পসার করে নিয়েছেন।

ডাঃ ব্যানার্জী চিরকালই কলকাতায় মানুষ। রেলওয়ে শহর জামালপুরের নাম অবশ্য আগে শুনে ছিলেন, কিন্তু এখানে এসে যে বসবাস করতে হবে সে কথা স্বপ্নেও ভাবেন নি। এর একটা পূর্ব ইতিহাস রয়েছে।

চপল কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে, হাউসার্জেন-সিপ্ শেষ করে, এফ. আর. সি. এস পড়বার জন্য বিলেতে যান। বছর চারেক বিলেতে কাটিয়ে সেখানকার হাসপাতালগুলোয় হাতে কলমে কাজ শিখে, প্রাইমারী এফ আর. সি. এস. পাশ করে তিনি যখন ফাইনাল ফেলোসিপের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন তাঁর মা গুরুতররূপে পীড়িত হয়ে পড়লেন। পিতৃহীন চপলকে অবিলম্বে দেশে ফিরবার জন্যে 'তার' করা হল।

চপল তখন দেশে যাবার পথে ভিয়েনাতে আমেরিকানদের প্রতিষ্ঠিত ইউনিভার্সিটি থেকে তিন মাসের কোর্স পড়ে নিউরো সার্জারির একটা ডিপ্লোমা নিয়ে ফিরলেন।

জাহাজ যখন আরব সাগরে, তখন ডাঃ ব্যানার্জী 'কেবল্' পেয়ে জানলেন তাঁর মা ইহজগৎ ত্যাগ করেছেন। দেশে গিয়ে খুবই মুষড়ে পড়লেন ডাঃ-ব্যানার্জী। একে এফ. আর. সি. এস. করে আসেননি, তারপর দেশ জুড়ে অভাব অনটনের হাহাকার। চারদিকে কোন আশার আলো নেই। কেউ তাঁকে কোন সাহায্য করতে এগিয়ে এলো না। তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে ডাঃ ব্যানার্জী বুঝতে পারলেন, পৃথিবীতে যার আছে তাকেই সকলে দেয়। যার নেই তার পেছনে কেউ ঘোরে না। অতএব এই আছের দলে থাকতে হলে তাঁকে এখন নিজের চেষ্টায় পসার জমাতে হবে।

কলকাতার আবহাওয়া বিলেত থেকে ফিরে এসে তাঁর আর ভালো লাগল না। আত্মীয় স্বজনেরাও হাত গুটিয়ে রইল। মরীয়া হয়ে একদিন চপল দিল্লীযাত্রা করলেন। সেখানে গিয়ে দেখা পেলেন মিঃ হিরালাল তরফদারের। মিঃ তরফদার একজন এম. পি। কিড্‌নি অপারেশনের জন্য তিনি যখন লণ্ডনে এসেছিলেন, তখন ডাঃ ব্যানার্জী লণ্ডনের 'হ্যামার স্মিথ' হাসপাতালের সিনিয়র হাউস সার্জেন ছিলেন। হাসপাতালে ভর্ত্তি থেকে রোগ মুক্তি পর্যন্ত সমস্তক্ষণ ডাঃ ব্যানার্জী মিঃ তরফদারকে সাহায্য করেছিলেন। মিঃ তরফদার সেই উপকার ভুলে যাননি।

…তাই যখন দিল্লীতে এসে ডাঃ ব্যানার্জী তাঁর সমস্ত দুঃখের কাহিনী মিঃ তরফদারের কাছে বিবৃত করলেন, তখন তিনি দিল্লীর নিকটে এক কুষ্ঠ রোগীদের হাসপাতালে তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার হিসাবে চপল ব্যানার্জীকে ঢুকিয়ে দিলেন।

—পুষ্পাশা দাস ছিলেন তখন সেই হাসপাতালের ওয়ার্ড সিস্টার। এক বর্ষণ

স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় চপল ফিরছিলেন হাসপাতালের রেসিডেন্ট কোয়ার্টারে, পূর্বাশাও ফিরছিলেন একই সময়। ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল। সেই বৃষ্টির মধ্যে যাওয়া যায় না। পূর্বাশাকে দেখে চপল ডাকলেন,—মিস্ দাস বৃষ্টিতে ভিজবেন কেন? আসুন আমার ছাতা আছে, দুজনে ভাগাভাগি করে ভেজা যাবে।

মিষ্টি হেসে পূর্বাশা জবাব দিয়েছিল, এক ছাতায় কি দুজনে আঁটে? তার চেয়ে আমি যখন ভিজেছি, ভিজেই যাই।—তাছাড়া পূর্ব বাংলার মেয়ে আমি। বৃষ্টিতে ভেজার অভ্যাস আছে। চপলের জেদে পূর্বাশার আপত্তি টেকে না। একই ছাতার নীচে ঝম ঝম বৃষ্টির মধ্যে গল্প করতে করতে তারা এসে একটা কাফেতে ঢোকে। চপলের অনুরোধে পূর্বাশা বৃষ্টি থামা না পর্যন্ত সেখানে বসে কফি খায়।

সেই থেকে তাদের প্রেম হল শুরু। তার পরিণতি হল পরিণয়ে। চপলের আত্মীয়-স্বজন যারা ছিল তারা কেউই এই অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন করল না। ফলে চপলের সঙ্গে তাদের যে ক্ষীণ সংযোগটুকু ছিল তাও ছিন্ন হয়ে গেল।

ফুটো পাহাড় পেরিয়ে বাইরে এসেই ট্রেনটা থেমে গেল। সব ট্রেনই সাধারণতঃ এ জায়গায় এসে থেমে যায়। জামালপুর জংশন স্টেশনের আগে এটা একটা হল্ট। একটা ছোট্ট ব্রীজ বা কালভার্ট-তার দুদিকে লম্বা রাস্তা চলে গেছে। রাস্তার দুপাশে তাসের ঘরের মত বাড়ি।

চপলের সঙ্গে একগাদা গিনিপিগ, খরগোস ও সাদা ইঁদুর ছিল। লোহার খাঁচায় ভরা। সেগুলো কিঁচির-মিচির করতেই চপলের ধ্যান ভাঙ্গে। তিনি বোঝেন তাদের খিদে ও তেষ্টা পেয়েছে। তিনি সঙ্গের পাউরুটির টুকরো তাদের ছিঁড়ে দেন ও খাঁচার ওপরের ওয়াটার বটল্ থেকে কিছুটা জল খুরির গুলোর ভেতর ঢালেন। প্রাণীগুলো সেগুলো গোগ্রাসে গিলতে থাকে। বিশেষ অনুমতি নিয়ে তিনি তাঁর কুপেতে এই প্রাণীগুলো সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন।

ডাঃ চপল ব্যানার্জী বরাবরই রিসার্চ মাইণ্ডেড্ ছিলেন। খালি পয়সা রোজগার করার দিকে ছোটবেলা থেকে তাঁর অভিপ্রায় ছিল না। তিনি ভাবতেন এমন একটা কিছু আবিষ্কার করবেন, যাতে মানুষের উপকার হয়। তাঁর আদর্শ ছিল স্যার জন হান্টার, এডিসন, লুইপাস্তুর। যাঁরা সারাজীবন আবিষ্কারের সাধনায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন।

বিয়ের কয়েকমাস পরেই দিল্লীতে একদিন দেখা হল ফণী হোড়ের সঙ্গে।

তিনি তখন এক বিলেতি কোম্পানীর মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ্। চপল ব্যানার্জীকে দেখে চমকে উঠে বললেন, আরে আপনি এখানকার ডাক্তার। মেডিকেল কলেজে চপল যখন ফিফথ্-ইয়ারের ছাত্র, ফণী তখন ফার্ষ্ট ইয়ারে ঢুকেছে। ফার্ষ্ট এম. বি পাশ করতে না পেরে, সে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। এখন সে মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ হিসাবে কাজ করছে।

ফণী হোড়ের দেখা পেয়ে চপল একটু আনন্দিত হল। ঘরোয়া কথাবার্তা অনেকক্ষণ ধরেই চলল। চপল ফণীকে নিজের কোয়ার্টারে নিয়ে এলেন। সেখানেই ফণী স্নান ও খাওয়া দাওয়া করল। পূর্ব্বাশার সঙ্গে ফণীর আলাপ পরিচয় হল।

বিকেলে চপল ও পূর্ব্বাশার সঙ্গে চা খেতে খেতে ফণী বলল, 'দেখুন চপলদা, একটা কথা আপনাকে বলি, যদি কিছু মনে না করেন ?'

—হ্যাঁ, হ্যাঁ বল না। তোমার কাছে আর মনে করার কি আছে।

—চপলদা আপনি আমার দাদার মত তাই বলছি। এই কুষ্ঠ রোগীদের হাসপাতালে পড়ে থেকে আপনি আপনার মেধা, অভিজ্ঞতা এবং তার উপরে আপনি আপনার সোনালী ভবিষ্যৎ নষ্ট করবেন না।

পূর্ব্বাশা চায়ের কাপটা নামিয়ে এক দৃষ্টে ফণী হোড়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—আপনি আমাদের কি করতে বলেন মিঃ হোড় ? আমাদেরও এই হাসপাতালে কাজ করতে ভাল লাগছে না। নেহাৎ এখানে টাকাটা একটু বেশী পাই এবং অন্য জায়গায় চান্স পাচ্ছিনা, সেজন্যই পড়ে আছি।

চপল এতক্ষণ চুপ করেছিলেন। পূর্ব্বাশা থামতেই একটু ধরা গলায় বললেন, দেখ ফণী আমারও খুব বড় হবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভাগ্যের ফেরে আমি এফ. আর. সি. এস. করে আসতে পারিনি। তাই এদেশে আমি আর কলকে পাচ্ছি না। জানই তো এদেশে অভিজ্ঞতার, কি মেধার কোন দাম নেই। এরা চায় ডিগ্রী। নয়ত মুরুব্বীর জোর।

এবার ফণী হেসে বলল,—দেখুন চপলদা ভাগ্য যদি বিশ্বাস করেন তাহলে আপনাকে একটা ভাল প্রস্তাব আমি দিই।

—কি ? কি ? শ্রোতারা আগ্রহে জিজ্ঞাসা করে ওঠেন।

—আমার ভায়রা ভাইয়ের বাড়ী ইস্টার্ণরেলের মুঙ্গের শহরে। জায়গাটা বিহারে। গঙ্গার ধারে। মুঙ্গের থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে রেলওয়ে শহর জামালপুর। এরই মাঝামাঝিতে সোফিয়াবাদ বলে একটা অঞ্চল আছে, সেখানে

আমাদের জানাশুনা কয়েকজন ক্ষেতি গৃহস্থ আছে। আমি বলি এই কুষ্ঠ হাসপাতালে পড়ে না থেকে, তাদের কাছ থেকে কিছু জায়গা নিয়ে, আপনারা সেখানে একটা নার্সিং হোম-কাম চেম্বার খুলুন। বৌদিও নার্স, আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন। ও জায়গায় যে সব ডাক্তাররা আছেন, তারা সবাই জেনারেল প্র্যাকটিস করেন।

চপলদা আপনি সার্জারি বিদ্যা শিখে এসেছেন। আপনার ডিগ্রী না থাকতে পারে, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি যদি একনিষ্ঠভাবে লেগে থাকতেপারেন এবং জেনারেল প্র্যাকটিসনার্স-দের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখতে পারেন, তা হলে আপনার সার্জারি খুব ভালভাবে চলবে।

পূর্ব্বাশা প্রস্তাবটা যেন লুফে নিল। তাদের জামালপুরে আসার সূত্রপাত এখানেই।

—ট্রেনটা তখন জামালপুর স্টেশনে সবে ঢুকছে। স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল চপলের ড্রাইভার কাম বাট্‌লার বিষেণ সিং। জাতে রাজপুত। এখন বিহারের বাসিন্দা।

চপল স্টেশনে নামতেই বিষেণ সিং একগাল হেসে বলল বাবুজী ট্রেন দো-ঘণ্টা লেট থী। ইসী লিয়ে মাইজী হামকো ভেজ দিয়া আপকো তুরন্ত ঘর লে জানে কে লিয়ে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে চপল যখন তাঁর গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন,তখন জামাল-পুর ওয়ার্কশপের ফোরম্যান সুজন চক্রবর্তী হন্তদন্ত হয়ে তাঁর সামনে এসে বললেন, ডঃ ব্যানার্জী, আমার ছেলে কালকে পাহাড়ের ধারে গিয়ে পরী দেখে ভীষণ নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়ে গেছে। কাল একবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। ভুল বকেছে সারারাত। আপনি যদি আজকে দেখতে যান খুবই উপকৃত হব।

—পরী! সে আবার কি? চপল আশ্চর্য হয়ে বলেন।

—সে অনেক কথা। আমাদের বাড়ী এলে বলব।

—আচ্ছা বিকেলে যাব। বলে চপল গাড়ি নিয়ে চলে যায়।

[দুই]

জামালপুর শহর। ইস্টার্ণ রেলওয়ের লুপ লাইনে অবস্থিত এক

জংশন স্টেশন শহর। শহরটার উৎপত্তি স্থানীয় রেলওয়ে ওয়ার্কশপ থেকে। শহরের বাসিন্দাদের বেশীরভাগই রেলওয়েতে কাজ করেন। শহরের একদিকে ঢেউ খেলানো পাহাড়। পাহাড়ের ওপর ঘন সন্নিবিষ্ট বুনো গাছের জটলা, নাগরিক জীবনের সংস্পর্শে এসে বিলুপ্ত প্রায়। পাহাড় কেটে কেটে সিঁড়ি তৈরী করা হয়েছে। সেই পাহাড়ের ওপর এক কালী মন্দির, কোন এক নিকট-বর্তী বাঙ্গালী ভদ্রমহিলার কারুণ্যে তৈরী হয়েছিল।

ছোট পাহাড়টা পেরিয়েই একটা অসমতল মালভূমি। তারপরে আবার একটা বড় পাহাড় শুরু হয়েছে। এ পাহাড়ের ঘন জঙ্গল এখনও কুঠারাঘাতে বিরল প্রায় হয়ে যায়নি। অর্থাৎ সূর্যালোক সেখানে প্রবেশ করলেও মনুষ্য পদার্পণের ঠিক যোগ্য নয়।

শহরের আর এক দিকে কারখানা। কারখানার পাশ দিয়ে এক ফালি রাস্তা সোজা চলে গেছে গ্রামগুলোর দিকে। পাহাড়টার বিপরীত দিকে শহরের পরিধি খুব বেশী দূর বিস্তৃত নয়। সেদিকেও জনবসতি নজরে আসে। আর একদিকে জামালপুর শহর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে, গঙ্গার তীরে সুপ্রসিদ্ধ মুঙ্গের শহর অবস্থিত। জামালপুর শহরের চৌমাথা থেকে পিচ বাঁধানো একটা মসৃণ হাইওয়ে মুঙ্গের পর্যন্ত চলে গিয়েছে। রাস্তার নাম মুঙ্গের রোড। জামালপুর ও মুঙ্গের শহরের মাঝামাঝি জায়গায়; এই মুঙ্গের রোডের ওপরে এক জনবহুল গ্রামাঞ্চলের নাম সোফিয়াবাদ। এই সোফিয়াবাদেই ডাঃ চপল ব্যানার্জীর নতুন নার্সিংহোম—পূর্বাশা নার্সিং হোম।

বিষেণ সিং গাড়িটা ফটকের ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে যখন পোর্টিকোর নীচে রাখল তখন হন্তদন্ত হয়ে পূর্বাশা ভেতর থেকে ছুটে এল।

—কি, ট্রেনে সকালে কিছু মুখে দিয়েছিলে তো? নাকি সব ভুলে গিনিপিগ আর খরগোসদের খাওয়াতেই ব্যস্ত ছিলে? তোমার যা ভুলো মন। মিষ্টি হেসে পূর্বাশা জিজ্ঞাসা করে।

—এই দেখ পূর্বাশা। তুমি আমাকে ঠিকই চিনেছো। সত্যিই আমি সকালে কিছুই খাইনি। মানে মনে ছিল না, আর সত্যই খরগোস আর গিনিপিগ-গুলোকে আহার আর ভিটামিন দিয়ে ফর্টি ফায়েড (**Fortified**) করা পাউরুটি খাওয়াচ্ছিলাম।

—আঃ।—তোমার খ্যাপামো আর গেল না। সারাজীবন এক্সপেরিমেন্ট করেই কি চলে। নিজের দিকে কি দেখবে না,—আচ্ছা; কিছুক্ষণ থেমে পূর্ব্বাশা বলে, ফরটিফায়েড কথাটার ঠিক অর্থ কি ?

—ফরটিফায়েড মানে কোন সামগ্রী জোর করে খাদ্যদ্রব্যের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া। এখানে আমি স্পেশাল অর্ডার দিয়ে কলকাতা থেকে পাউরুটির ভেতর আয়রণ আর ভিটামিন ঢুকিয়ে ফর্টিফায়েড করে এনেছি। দেখছিলাম পাশাপাশি দুটো গিনিপিগ একজন সাধারণ পাউরুটি আর একজন ফর্টিফায়েড করা পাউরুটি খেলে তাদের কি পরিবর্তন হয়।

এতক্ষণে বিষেণ সিং চপলের লাগেজপত্র সমস্ত বাড়ির ভেতর নিয়ে গেছে,, বলদেব বলে একজন গৃহ ভৃত্যের সাহায্যে। বলদেব স্থানীয় লোক। খুব সস্তাতে তাকে চপলরা কাজে লাগাতে পেরেছেন। এরও একটা পূর্ব ইতিহাস আছে।

সোফিয়াবাদের পূর্বদিকে পাটমু বলে এক জায়গা আছে। সেখানে চপল একদিন কলেরার কেস দেখতে গিয়েছিলেন। এক বিধবা বুড়ির অসুখ। স্যালাইন দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। কি করেন চপল, বাধ্য হয়ে সেখান থেকেই একটা কাঁচের বড় বোতল গরম জলে পরিশুদ্ধ করে, তার ভেতর তিনটে স্যালাইনের ট্যাবলেট দিয়ে নরম্যাল স্যালাইন তৈরী করলেন।

আশে পাশে কোন স্ট্যান্ডও নেই যে ঝোলাবেন। ভাবছিলেন কি করবেন ? হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। চপল বিধবার ছেলে বলদেবকে বললেন, তুমি এই বোতলটা ধরে দাঁড়িয়ে থাক। স্যালাইনের লবন জল চলতে লাগল। তিন ঘণ্টায় তিন বোতল শেষ। বলদেব ঠায় দাঁড়িয়ে রইল স্যালাইনের বোতল-গুলো ধরে। চপলের কম্পাউন্ডার নরুবাবু মাঝে মাঝে এসে বোতলগুলো বদলে দিয়ে গেলেন।

স্যালাইন দেওয়া যখন শেষ হল, তখন চপল আবার গিয়ে দেখেন বুড়ি থর থর করে কাঁপছে। চপল বুঝলেন, রাইগার (**Rigor**) শুরু হয়েছে দ্রুতলয়ে স্যালাইন দেবার জন্যে। তিনি একটা কম্বল বুড়ির গায়ে চাপিয়ে দিলেন। আশ্চর্য—তিনদিন বাদে বুড়ি একেবারে নিরাময় হয়ে গেল। সেই থেকে পাটমের ঘরে ঘরে চপলের প্র্যাকটিশ বাঁধা হয়ে গেল। আর বলদেবকে চপল পেলেন গৃহভৃত্য রূপে।

চপল এখনও মাঝে মাঝে ভাবে, তিনি মেডিক্যাল কলেজে পড়ার আর বিলেতের হাসপাতালগুলোয় কাজ করার সময় কি শিখেছিলেন,—আর এখানে তিনি কি ভাবে কাজ করছেন ? হ্যামারস্মিথ হাসপাতালের প্রফেসর লং-এর

ভাষায়—একেবারে প্রিমিটিভ—একদম স্যাভাজ। কিন্তু অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা। বিলেতের ধনাঢ্য পরিবেশ, উন্নত সাজসরঞ্জাম, ওষুধপত্র তো আর এই বিহারের গ্রামাঞ্চলে পাওয়া যাবে না। ডাঃ চপল ব্যানার্জী আজ এখানকার সাক্ষাৎ দেবতা। মুকুটহীন অধিপতি।

বিকেলে চায়ের টেবিলে বসে, পূর্বদিকের পাহাড়টার দিকে মুখ করে, পা দোলাতে দোলাতে চপল বললেন, জান পূর্ব্বাশা, জামালপুরের এই পাহাড় ও পাহাড়তলী আমার খুব ভাল লাগে।

চপলের কথা শুনে পূর্ব্বাশা হঠাৎ বলে উঠল,—তুমি বোধ হয় একটা ব্যাপার জান না। এই পাহাড়ের আনাচে কানাচে ইদানিং একটু ভৌতিক রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

—কি রকম ? কৌতূহলী হয়ে চপল জিজ্ঞাসা করেন।

—দিন কয়েক আগে ফুটো পাহাড়ের ধারে একজন রেলের ওভারসিয়ার ট্রলিতে করে লাইনের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন লাইন ঠিক আছে কিনা দেখতে। তাঁর ট্রলিটা ঠেলছিল দুজন কুলি। ফুটো পাহাড়ের কাছাকাছি এসে তারা দেখতে পায় সুন্দরী সুবেশা এক যুবতী পাহাড় থেকে লাফাতে লাফাতে নামছে। তার চারদিক আলোয় ঝলমল করছে। ব্যাপারটা এতই আকস্মিক ও অভাবনীয় যে ভয় পেয়ে কুলিরা পালিয়ে যায় এবং ওভারসিয়ারবাবুও তাদের পদানুসরণ করেন।

লোকজন নিয়ে পরে তাঁরা যখন ফিরে আসেন, তখন দেখেন, ট্রলিটা রেল লাইনের ওপরে ঠিকই রয়েছে কিন্তু ওভারসিয়ার বাবুর কিট ব্যাগটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার ভেতরে মেরামতির সব যন্ত্রপাতি ছিল।

হঠাৎ চপলের মনে পড়ে যায় সুজন চক্রবর্তীর ছেলেকে দেখতে যাবার কথা। তিনি বলে ওঠেন আরে তাইতো ! সুজন বাবুওতো আজ সকালে বললেন, পরী দেখে তাঁর ছেলে অজ্ঞান হয়ে গেছে। তাকে আজ সন্ধ্যায় দেখতে যাবার কথা।

পূর্ব্বাশা ফিক্ করে হেসে বলে, দেখো বাবা তুমি যেন আবার পরীর খপ্পরে পড়োনা, তাহলে আমার অবস্থা কাহিল হয়ে যাবে।

—আরে না না। এসব কোন চোর বদমাইসের কাণ্ড হবে।

সুজন চক্রবর্ত্তীর বাড়িতে গাড়িটা নিয়ে যখন চপল পৌঁছালেন, তখন চার-দিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। রাস্তার দুধারে ল্যাম্পপোস্টের আলো জ্বলছে।

রাস্তাটা পাহাড়ের কাছেই—নাম ক্যেন্ট রোড। সেখান থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পাহাড়ের পাদদেশে পেঁছানো যায়। রোগীকে পরীক্ষা করে চপল দেখলেন, সে ভালই আছে। তার নার্ভাস ব্রেক-ডাউন হয়েছিল কোন কারণে হঠাৎ শক্ পেয়ে। তার মুখে পুরো ঘটনার বিবরণ শোনা গেল।

সে স্থানীয় রেলের হাইস্কুলের উঁচু ক্লাশের ছাত্র। রোজকার মত সেদিন বিকেলে সে পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিল। ফিরতে তাঁর একটু দেরী হয়। পাহাড়ের ওপরকার মালভূমির ওপর উঠে সে যখন পাহাড়ের পাথরের ওপর দিয়ে উত্তর দিকে এগোচ্ছিল, তখন মেয়েলি কণ্ঠের একটা খিল্‌খিল্ হাসি শুনে সে উৎকর্ণ হয়ে দূরে তাকাতেই দেখে পাহাড়ের গা বেয়ে লঘু পায়ে একজন সুন্দরী অল্প বয়সী রমণী ক্ষিপ্রগতিতে নেমে যাচ্ছে। নির্জন পরিবেশে এই ব্যাপারটা দেখে সে হতভম্ব হয়ে যায়। কারণ এইরকম নির্জন পাহাড়ে এই ধরনের কোন ভদ্রমহিলার এভাবে আসা ও পাহাড় বেয়ে নামা সম্ভব নয়। রহস্য ভেদ করার জন্য ছেলেটি তার পেছন পেছন নামতে থাকে। নামতে নামতে মেয়েটি পাহাড়ের মাঝামাঝি এসে অদৃশ্য হয়ে যায়।

অদৃশ্য রমণীর হদিশ করার জন্য সে যখন পাহাড়ের ফাটলের গায়ে উঁকি ঝুঁকি মারছে তখন সেই সুন্দরী যুবতীর পরিবর্তে এক বীভৎস মুখের আবির্ভাবে সে সচকিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। বিরাট হুঙ্কার দিয়ে সেই মূর্তিটি ছেলেটিকে তাড়া করে। ফলে সে ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। জ্ঞান ফিরে এলে সে দেখে পাহাড়ের নীচে জলাধারের কাছে সে শুয়ে আছে। আর তাকে ঘিরে রেখেছে কতকগুলো বিহারী রাখাল ছেলে।

ছেলেগুলো সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে জলাধারের পাশে তাকে পড়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে তার মুখে ও মাথায় জল দিয়ে পরিচর্যা করে সুস্থ করে বাড়িতে দিয়ে আসে।

সমস্ত ব্যাপারটাই রহস্যজনক। একদল বদমাইশ লোকের কাজ বলে মনে হয়। সিগরেটটা ধরিয়ে মরিস গাড়িটা করে চপল বাড়ি ফিরছিলেন। পাহাড়ের ধার দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন। পাহাড়ের তলায় দৃষ্টিনন্দন এক মাঠ। সবুজ ঘাসে ভরা। তার চার দিকে পিচ দিয়ে বাঁধানো রাস্তা। এক পাশে সুদৃশ্য জলাধার। পাহাড়টার গা ঘেঁষেই রেলের কলোনী। মাঠটাকে পাক খেয়ে নিয়ে, গাড়িটা কুইন্স রোড হয়ে রেলের কলোনীর ভেতর ঢুকে ডি. ভি তুলসী রোড হয়ে সোফিয়াবাদের দিকে এগোল। তুলসী রোড থেকেই

অ-রেলওয়ে বাসিন্দাদের বসতি শুরু হয়েছে। ফুটো পাহাড়ের কাছে এসে গাড়িটা একটু থামল। স্থানীয় লোকেদের ছোট্ট জটলা। চপলকে দেখে দু'চারজন লোক হাত ঠুকে সেলাম করল। চপল তাদের আলোচনার ধারাটা শুনলেন। পাহাড়ে পরীর আবির্ভাব জামালপুর শহরের নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রায় বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

সেই পরীর ব্যাপার নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল। ওভারসিয়ার বাবুর কীট ব্যাগটা রেল লাইনের ধারে পাওয়া গিয়েছে। পুলিশে খবর দেওয়া হয়নি। কারুর কারুর ধারণা এ কোন অদৃশ্য মায়াবিনীর কাজ।

চপল সুজন চক্রবর্তীর ছেলেকে দেখে এসেছে শুনে তারা কৌতূহলী হয়ে ব্যাপারটা সম্বন্ধে চপলের মতামত জানতে চাইল। চপল পরিষ্কার বললেন, এটা সমাজ বিরোধীদের কাজ। তাদের খুঁজে বার করতে হবে।—লেকিন ডাগদার সাব ইয়ে কাম তো উয়ো কুলি লোকভি কর সকতা।

চপল বললেন, হ্যাঁ তা পারে। কিন্তু কুলিদের সঙ্গে ওই পাহাড়ে দেখা পরীরই বা কি সম্বন্ধ। দুটো ব্যাপারের মধ্যে কোন সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না।

—বড়া তাজ্জব বাত…বড়া তাজ্জব বাত! সমস্বরে লোকগুলো বলতেলাগল।

বিষেণ সিং গাড়িটা ছেড়ে দিল। রেললাইনের কালভার্টের তলা দিয়ে গাড়িটা সোজা এগিয়ে চলল সোফিয়াবাদের দিকে ডি. ডি তুলসী রোড ধরে। তুলসী রোড মুঙ্গের রোডের সঙ্গে যে জায়গাটায় এসে মিশেছে সে জায়গায় কয়েকটি বাড়ির জটলা। সে অঞ্চলটার নামই সোফিয়াবাদ। সেখান থেকে মুঙ্গের শহরটা আড়াই মাইল দূরে। জামালপুর দেড় মাইল।

গেটের ভেতর দিয়ে গাড়িটা ঢুকল। নাতিবৃহৎ নার্সিংহোম। মাঝখানে একটা ছোট্ট সবুজ ঘাসের লন। তার একপাশে নার্সিংহোমের বাড়ি। আর এক পাশে ডাঃ চপল ব্যানার্জীর রেসিডেন্ট কোয়ার্টার। মাঝখানে ছাড়া ছাড়া জমিতে বাহারি ফুল গাছের জটলা।

চপলকে ফিরতে দেখে পূর্বাশা তাঁর হাত থেকে ব্যাগটা নামিয়ে রাখল। কোটটাও গা থেকে খুলে নিয়ে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে দিল। তারপর মৃদু হেসে জিগ্যেস করল, পাহাড়ে পরীর খবর কতদূর?

চপল আনুপূর্বিক ঘটনা বিবৃত করলেন। শুনে পূর্বাশার মনে ভয়ের ছায়া নামল। গালে একটা আঙ্গুল রেখে সে বলল, বাব্বা! রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠেছে যে। কিন্তু ব্যাপার স্যাপার শুনে আমারও যে ভয় লাগছে।

এখান থেকে পাহাড়টার দূরত্ব খুব বেশী নয়। আর এই সোফিয়াবাদে বলতে গেলে আমরাই একমাত্র ভদ্র বাঙ্গালী পরিবার রয়েছি। আমাদের উপর এখানে যদি কোন আক্রমণ হয় তাহলে তো মুস্কিল।

—না, না আমাকে এখানে সবাই ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে। স্থানীয় লোকেরাই আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে।

—কিন্তু, এই রহস্যের একটা কিনারা হওয়া তো উচিৎ। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে ?

—না। দিল্লী-দূর অস্ত।...

[তিন]

জামালপুর রেলওয়ে ইনস্টিটিউট, স্থানীয় দুটো সিনেমা হলের অন্যতম। রেলের অধিবাসীদের অধিকাংশ এক কালে বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালীরা যেখানেই যায় একটা কালীবাড়ি খোলে ও সেই সঙ্গে একটা জলসাঘর।

জামালপুর পাহাড়ের ওপর যেমন একটা কালী মন্দির এক বাঙ্গালী ভদ্র মহিলা তৈরী করেছিলেন, সেরকম রেলের নেতৃস্থানীয় বাঙ্গালীরা এক কালে ইনস্টিটিউট তৈরী করেছিলেন রেলের খরচে, তাদের সাংস্কৃতিক জীবনটাকে প্রতিফলিত করতে।

সেদিন রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের প্রেক্ষাগৃহে একটা জলসার আয়োজন করা হয়েছে। কলকাতা থেকে আসা এক বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সম্মানে।

রেলওয়ে কারখানার লেবার অফিসার সুবল করের একমাত্র মেয়ে এষা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছে। প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ। এষা জামালপুর কলেজে বি. এ. পড়ে। অপরূপ রূপসী বলে এষার যেমন খ্যাতি, সুকণ্ঠী বলেও তার সেরকম নাম ডাক। এষা তখন জামালপুরের বিউটি কুইন। ছোট্ট জামালপুর শহরে তাকে নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা। অল্পবয়সী যুবকদের আলোচনার খোরাক সে।

—"আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে..."

এষার সুরেলা কণ্ঠে সমস্ত হল অভিভূত। বিমুগ্ধ হয়ে শুনছে তারা। সামনের চেয়ারে জামালপুর ও মুঙ্গের শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বসে আছেন। বেশীরভাগই রেলের অফিসার তাঁরা। তাঁদের মধ্যে বসেছিলেন মুঙ্গেরের টোবাকো ফ্যাক্টরির পারচেজ অফিসার রূপক রায়চৌধুরী। রূপকের বয়স

তিরিশ ছুঁই ছুঁই। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় সে বড়লোকের ছেলে এবং অবস্থাপন্ন। আর সে নিজেও তার পদমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন।

এষার ওপর রূপকের আকর্ষণ বরাবরই ছিল। যেদিন থেকে কর পরিবারের সঙ্গে তাদের সখ্যতা হয়েছে। এষার মা বিনতা কর রূপকের দেশের মেয়ে। সেই সূত্রেই কর পরিবারের সঙ্গে রূপকের পরিচয়। বিনতা দেবী মনে মনে চাইতেন এষা রূপককেই বিয়ে করে সুখী হোক।

...কিন্তু আজকালকার মেয়েদের মতি গতি বোঝা ভার। সাম্য, মৈত্রী, স্ত্রী স্বাধীনতা নিয়ে এষা বড় বড় কথা বলে। বিনতা কর এসব বোঝেন না। কোনদিন বুঝতেই চাননি। রূপকের মত সামাজিক পদমর্যাদার ও আর্থিক সচ্ছলতায় ভরা ঘরে যদি এষা পড়ে, তাহলে তিনি খুবই আনন্দিত হবেন। রূপক যে মনে মনে এষাকেই চায় সে সম্বন্ধেই তিনি সুনিশ্চিত, কিন্তু এষার মন বোঝা ভার। কর্তা সুবল কর বরাবরই স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষে। তিনি নিজের মেয়ের মতের বিরুদ্ধে কোন দিনই কিছু করতে চান না।

রূপক উসখুস করছিল। বাইরে অন্ধকারটা গাঢ় হয়ে এসেছে। কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়িটা দেখল আটটা বাজে। সে সময় প্রেক্ষাগৃহে কিছুক্ষণের জন্য বিরতি নামল। সেই অবসরে রূপক কর পরিবারের সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহের বাইরে আসে। প্রেক্ষাগৃহের বাইরের চারপাশে লাল সুর্‌কি বিছান রাস্তা। আর এক দিকে কতকগুলো পাম গাছের জটলা। তার ওপাশে প্রাইভেট বাড়ির উঁচু পাঁচিল। প্রেক্ষাগৃহের পেছনে টেনিসের হার্ডকোর্ট। তার পেছনে রেলওয়ে ইন্সটিটিউটের লাইব্রেরী, রিডিং রুম ও লাউঞ্জ। সেখানে টেবিল টেনিস বোর্ড থেকে টুকটাক শব্দ ভেসে আসছে।

বাইরে পায়চারি করতে করতে রূপক এক সময় বিনতা করকে বলে, মাসীমা, এখনতো আর ভাল প্রোগ্রাম কিছু নেই, আমার গাড়িতে চলুন না। পাহাড়ের ধার থেকে একটু ঘুরিয়ে, আমি আপনাদের বাড়িতে পেঁছে দেব।

বিনতা দেবী ইঙ্গিতটা বুঝলেন। তিনি ঈষৎ হেসে বললেন তুমি এষাকে নিযে বরং ঘুরে এস। আমরাই এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা, আমরা কি করে শেষ না দেখে যাব? তুমি ফিরে এসে ওকে এখানে পেঁছে দিয়ে যেও। প্রস্তাবটা রূপক লুফে নিল। এষাও নিমরাজী হয়ে সায় দিল। অস্টিনটা নিজেই ড্রাইভ করে পাহাড়ের দিকে রূপক এষাকে নিয়ে চলল। ইন্সটিটিউটের গেটের

কাছে আসতেই এষার চোখে পড়ল মলিন বসন ক্ষীণকায় বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার একজন যুবক করুণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এষা চিনল— সে হরিপদ মাইতি। কারখানার ডেপুটি চীফ মেক্যানিকাল ইঞ্জিনিয়ারের (ডি. সি. এস. ই) অফিসের একজন কেরানী। হরিপদর সঙ্গে এষার বার দুই পরিচয় হয়েছিল।

কর বাবুরা সপরিবারে একবার কাশী বেড়াতে গিয়েছিলেন। কোথাও থাকবার জায়গা পাচ্ছেন না। স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে বিপন্ন হয়ে সুবল বাবু কাশীর এক ধর্মশালা থেকে বেরিয়ে ভাবছেন, এবার কি করবেন? সেই সময় হরিপদ মাইতির সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়। হরিপদ চালাক ও চটপটে ছেলে ছিল। সে সুবল বাবুদেরকে তার পরিচিত এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়িতে নিয়ে গেল দিন কয়েকের জন্যে পেইং গেস্ট হিসাবে স্থান দেবার জন্যে। সেই থেকে তাঁদের পরিচয়ের সূত্রপাত।

জামালপুরে এসে হরিপদর সঙ্গে এষার আরও একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। রেলের কর্মচারীদের একটা অনুষ্ঠানে। হরিপদ সেখানে এক স্বরচিত কবিতা পাঠ করে। সেটা এষাকে মুগ্ধ করে। হরিপদ বেশী লেখাপড়া না করলেও সাহিত্য জ্ঞান তার খুবই বেশী ছিল। এষাও গল্প, উপন্যাস পড়তে ভালবাসত। তাদের পরিচয়ের পালাটা কিন্তু বেশীদূর এগুতে পারেনি। তাদের সামাজিক ও আর্থিক তারতম্য তার প্রধান অন্তরায় ছিল।

পাহাড়তলীর ধারে রূপকের সঙ্গে গাড়িতে যেতে যেতে, হরিপদর ম্লান মুখটাই এষার বারবার মনে পড়ছিল।

—তুমি এত কি ভাবছ এষা? স্টিয়ারিংটা ঘোরাতে ঘোরাতে রূপক বলে।

—না, এমন কিছু নয়। হরিপদ বাবুর সঙ্গে কোন কথা না বলে চলে এলাম সেটাই খারাপ লাগছিল।

গাড়িটা পাহাড়টাকে পাক দিয়ে ঘুরতেই সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে একটু অসন্তোষের স্বরে রূপক বলে, লোকটা কি করে?

—এখানকার অফিসের কেরানী।

—ও! এ পেটি ক্লার্ক! ফুঃ······রূপক একটা অবজ্ঞা সূচক মন্তব্য করে।

দপ করে এষা জ্বলে উঠে বলে—আর্থিক ওজন বুঝে আমি মানুষকে

বিচার করি না রূপক বাবু। আমি মানুষকে বিচার করি তার মনুষ্যত্ব দিয়ে, তার অন্তরের পরিচয় দিয়ে। মানুষ হিসাবে হরিপদ বাবু খাঁটি লোক।

মাঠটাকে ঘুরে গাড়িটা তখন রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের কাছাকাছি এসে গেছে। এমন সময় এষা দেখল জামালপুর মিউনিসিপ্যালিটির বিল্ডিং এর-গেটটার কাছে হরিপদ দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে এষা বলে ওঠে গাড়িটা এখানেই থামান মিঃ রায় চৌধুরী। মুখ কালো করে এষাকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে রূপক চলে যায়।

হরিপদ এতটা আশা করেনি। জামালপুর একটা রেলওয়ে টাউন। রেলওয়ের অধিবাসীরা নিজেদের পদ মর্যাদা সম্বন্ধে খুবই সচেতন। একজন পদস্থ অফিসারের মেয়ের সঙ্গে একজন কেরানীর মেলামেশা সাধারণে ভাল চোখে দেখবে না, হরিপদ এটা জানত; কিন্তু এষার জন্য নিজের মনের থেকে হরিপদ একটা টান অনুভব করে। সেটা এড়ানও তার পক্ষে শক্ত।

তাই এষাকে দেখে উজ্জ্বল মুখে সে এগিয়ে আসে। হরিপদকে সঙ্গে করে এষা আবার ইনস্টিটিউটের প্রাঙ্গণে এসে ঢোকে। হরিপদকে সে বলে, আসছে শনিবার আমার জন্ম দিনে আমাদের বাড়িতে আপনার আসা চাই। একটা ছোট্ট পার্টি আছে। আপনাকে একটা স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনাতে হবে।

হরিপদর সারা দেহমনে একটা অনাস্বাদিত পূর্ণ শিহরণ জাগল। তার ত্রিশ বছরের জীবনে কেউ তো তাকে এভাবে আন্তরিক আমন্ত্রণ জানায় নি। সে আমতা আমতা করে আচ্ছা আসব বলে সরে যায়।

এষাকে হরিপদর কাছে ছেড়ে দিয়ে রূপক ইনস্টিটিউটের গা বেয়ে ব্রীজের ওপর দিয়ে গাড়িটা ড্রাইভ করে। অশ্বক্ষুরাকৃতি ব্রীজটা রেলওয়ে লাইনের ওপর দিয়ে জামালপুর শহরের দুই ভাগকে সংযুক্ত করেছে।

ওপারে নেমেই একটা চৌমাথার মোড়। সেখানকার একটা ছোট্ট আইল্যাণ্ডে একটা টিউবওয়েল। সেটা চালিয়ে আঁজলা ভরে স্থানীয় একজন কুলী রমণী তার ছেলেকে জল খাওয়াচ্ছে। সেখান থেকেই মুঙ্গের রোড শুরু।

আইল্যাণ্ডটা চক্কর দিয়ে রূপক মুঙ্গের রোড ধরে মুঙ্গেরের দিকে গাড়ির স্পীড্ নিয়ন্ত্রিত করে এগুতে থাকে। এষার ব্যবহারে তার মুখটা শুধু যে কালো হয়েছে তা নয়, তার মনটাকেও মেঘাচ্ছন্ন করে দিয়েছে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে সে পূর্বেকার ঘটনাগুলো রোমন্থন করছিল। আর এখন তার

করণীয় কি তাই মনে মনে ভাবছিল। সামান্য একটা কেরাণীর সঙ্গে তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে এটা তার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছিল। আর এষার রুচিকেও বলিহারি। তার মত একজন অবস্থাপন্ন পৌরুষদীপ্ত অফিসারকে ছেড়ে দিয়ে, এষা কিনা সামান্য একটা কেরাণীর সঙ্গে চলে গেল! সামনের শনিবার এষার জন্মদিনের পার্টিতে বিনতা করকে সবই খুলে বলবে বলে রূপক মনে মনে ঠিক করল।

সোফিয়াবাদ আসতেই তার চিন্তার মোড় ঘুরল। ডি. ডি. তুলসী রোড যেখানে মুঙ্গের রোডের সঙ্গে মিশেছে, তার দক্ষিণ-পূর্বদিকের জামালপুরের পাহাড়টার দিকে আড়চোখে চেয়ে রূপক ভাবল, আর একবার পাহাড়তলীটায় চক্কর দিয়ে আসি। ডানদিকে গাড়ি ঘুরিয়ে লেবেল ক্রসিংটা পেরিয়ে তুলসী রোড ধরল সে। ঠিক সে সময়কার বাঁদিককার এক সুদৃশ্য বাগানওয়ালা বাড়ির দিকে তার চোখ ক্ষণিকের জন্য আটকে গেল। নীল টিউব লাইটে লেখা "পুষ্পাশা নার্সিং হোম।" নার্সিং হোমের গেটটা দিয়ে ডাঃ চপল ব্যানার্জীর গাড়িটা সে সময় বেরিয়ে রূপকের গাড়ি অতিক্রম করে বিপরীত দিকের পথটা নিল। ডাক্তার হাত তোলাতে রূপকও তাকে হাত তুলে প্রত্যাভিবাদন জানাল। রূপক জানে ডাক্তার এখন মুঙ্গেরের টোবাকো কোম্পানীর ফ্যাক্টরিতে যাচ্ছেন। সেখানকার মেডিক্যাল অফিসার মেজর কানোরিয়া তাঁর বন্ধু। মুঙ্গেরের এক ককটেল পার্টিতেই ডাক্তার ব্যানার্জীর সঙ্গে তাঁর ক্ষণিকের পরিচয় হয়েছিল।

রূপকের গাড়িটা স্পীড নিল। রাত তখন দশটা বাজে। পাহাড়ের কাছাকাছি এসে রূপক গাড়িটা পার্ক করল। রেল লাইনের নীচের রাস্তায় সে উদ্দেশ্যহীনভাবে হেঁটে চলল। চারদিক নির্জন। রূপকের মাথার মধ্যে কিন্তু আগুন জ্বলছে। সে যে কোথায় যাচ্ছে? কেন যাচ্ছে? তাও সে জানে না। এষার ব্যবহার তার মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। টানেলটার ভিতরে না ঢুকে, লাফিয়ে লাফিয়ে সে পাহাড়টার ওপরে উঠল।

পাহাড়ের ওপরটায় উঠেই ঠাণ্ডা হাওয়ায় সে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। আর তখনই তার মনে একটা ভয় জাগল।

—এমন সময় বাঁ পাশের বড় পাথরটার আড়াল থেকে দুজন পুরুষের কথোপকথন শুনতে পেয়ে সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। স্থানীয় হিন্দীতে তারা কথা বলছিল। রূপক বুঝতে পারল—এরা গুণ্ডা শ্রেণীর লোক। কাছের

একজন ধনী গৃহস্থ বাড়িতে ডাকাতি করবার প্ল্যান আঁটছে। রূপক উঠে তাদের দেখতে গিয়ে হঠাৎ পা হড়কে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো সেখানে ছুটে এল। রূপক সবিস্ময়ে দেখল লোকগুলোর মধ্যে একজন শাড়ি পরিহিত বালককে। তার মাথার পরচুলটা লাগান থাকলে তাকে নারী বলেই ভ্রম হত। রূপককে তারা চেপে ধরে। রূপক অনেক কাকুতি-মিনতি করে বলল, আমাকে প্রাণে মেরো না। আমি তোমাদের কথা কাউকে বলব না।

রূপক তাদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারল তারা টাকার লোভে সব করতে পারে। তারা জাতে বাভন্। জামালপুরের পশ্চিমদিকে থাকে।

রূপকের মাথায় একটা মতলব এল। সে তাদের নেতা—উচিৎ সিংকে বলল, একজন লোককে তোমরা হাপিস করতে পারবে? অনেক টাকা দেব। লোভে দপ্ করে জ্বলে উঠল উচিৎ সিং-এর চোখ। ভাঙ্গা বাংলায় সে বলল, কাকে আপনি খুন করতে চাহেন বাবুসাব্? আর কত রুপিয়াই বা হামাদের দিবেন?

একটা মোটা অঙ্কের টাকা আমি তোমাদের দেব। ওয়ার্কশপের এক কেরাণীকে হাপিস করে দিতে হবে। তাকে আমি দেখিয়ে দেব সামনের শনিবার।

– তবে কম টাকায় হোবে না বাবুসাব্। মোটা রুপেয়া হামাদের দিবেন তবে কাম করব। রুপিয়া লিয়ে হামরা সোবই করতে পারি।

সেদিন সন্ধ্যের অপমানের স্মৃতিটা বিদ্যুতের ঝলকের মত রূপকের মস্তিষ্কে ঝিলিক দিয়ে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে ভেবে নিয়ে সে বলল আমি রাজী। তোমাকে এখন আমি অল্প কিছু টাকা আগাম দেব। আমার গাড়ির কাছে এস। কাজ শেষ হলে বাকীটা দেব।

সর্দারের কথায় সেই সুশ্রী ছেলেটা বেশবাস বদলে রূপকের সঙ্গে সঙ্গে এল। সে জাতে পাঞ্জাবী। তার নাম উজ্জ্বল সিং। টাকাটা নিয়ে সে বলল আমাকে দরকার হলেই সন্ধ্যের পর এই ফুটো পাহাড়ের কাছে এসে তিনবার জোরে হুইসিল বাজাবেন, তাহলেই আমাদের কেউ না কেউ আপনার কাছে চলে আসবে। এই সমস্ত পাহাড়টা জুড়ে আমাদের ডেরা।

রূপক গাড়ি চালিয়ে মুঙ্গেরে চলে গেল।

* * *

শনিবারের সন্ধ্যা। জামালপুরের প্রিন্সেস রোডের রেলওয়ে অফিসার মিঃ করের বাংলোয় সেদিন মহাধুমধাম। তাঁর একমাত্র মেয়ে এষার জন্মোৎসব। এষা আজ কুড়ি বছরে পদার্পণ করবে। আয়োজনের কোন ত্রুটি রাখেন নি কর সাহেব। বিরাট হাতাওয়ালা কোয়ার্টারে লাল সুড়কী ছড়ান রাস্তা। সামনে গেটের পাশ দিয়ে তারের বেড়া। সেখানে মেহেদি পাতার ঝাড়, একটা সুন্দর পর্দার সৃষ্টি করেছে। ভেতরে একটা ছোট্ট তিনকোণা সবুজ লন। তার ভেতরে বেতের একগাদা চেয়ার ইতস্ততঃ ছড়ান রয়েছে। মাঝখানে বেতের টেবিল। বিরাট কম্পাউণ্ডের মাঝখানে মিঃ করের কোয়ার্টার।

পেছন দিকে যাবার একটা সবুজ ঘাসের গালচে বিছানো। কর সাহেব তাঁর বাড়ির ভেতরকার হল ঘরটায় অতিথিদের খানাপিনার ব্যবস্থা করেছেন। টেবিলটার ওপর প্লেট ও কাঁটা চামচগুলো সাজাতে সাজাতে বিনতা দেবী ঘাড় বেঁকিয়ে বললেন,—আচ্ছা এষা তোর আক্কেলটা কি বলত? রূপক একজন বড়লোকের ছেলে। তার ওপর বড় অফিসার। অনেক টাকা মাইনে পায়। তুই তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করলি বলত? আর রূপককে ছেড়ে কোথাকার কোন এক হরিপদ কেরানী, তার সঙ্গে মিশতে যাস কেন? নিজের প্রেস্টিজ আর পজিশন সম্বন্ধে তোর কোন ধারণাই নেই দেখছি?

—দেখ মা, আমি মানুষকে মানুষ হিসাবেই বিচার করতে চাই—তার পদমর্যাদা বা আর্থিক অবস্থার মাপকাঠিতে নয়—রূপকবাবুর খালি নিজের টাকার দম্ভোক্তি, অফিসের চাকরি, বাড়ির অবস্থা শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। সে তুলনায় হরিপদবাবু একটা স্নিগ্ধ প্রদীপের মতন চারদিক আলো করে রেখেছেন; কিন্তু কোন দেমাক নেই।

বিনতাদেবী মুখ নেড়ে কি একটা কড়া উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু পোর্টিকোতে একটা গাড়ির হর্ণের আওয়াজ পেয়ে বিনতাদেবী হন্তদন্ত হয়ে বাইরে যান। এষা বোঝে রূপক এসেছে। মুখ না তুলে সে একইভাবে টেবিলের ওপরে ফ্লাওয়ার ভাসটা সাজাতে থাকে।

—গুড ইভনিং মিস কর। উইশ হউ মেনি হ্যাপি রিটার্নস।···বলেই রূপক তার হাতে একটা প্যাকেট খুলে ধরে। সুন্দর লকেট বসানো একটা সোনার হার ঝলমল করছে। বিনতা দেবীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি রূপকের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলেন,—সত্যিই তুমি হীরের টুকরো ছেলে রূপক। কি সুন্দর একটা প্রেজেন্ট করেছো। তারপর এষার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন,

—দ্যাখ রূপক তোকে কত ভালবাসে। একটু থেমে, মেঝের ওপরকার কার্পেটে পা ঘসতে ঘসতে বললেন,—তোমরা দুজনে গল্প গুজব কর। আমি আসছি। তাঁর কথা শেষ হবার আগেই কলিং বেলটা বেজে উঠল। বেয়ারা দরজার কাছে পেঁছবার আগেই ঘরে এসে ঢুকল হরিপদ মাইতি। তার হাতে এক গোছা রজনীগন্ধা ফুলের ডাঁটি। সুমিষ্ট গন্ধে চারদিক সুরভিত হয়ে উঠল। সকলকে নমস্কার জানিয়ে হরিপদ এষার হাতে পুষ্প স্তবকটি তুলে দিয়ে বলে —আপনার জন্মদিনে প্রার্থনা করি এই শুভ রজনীগন্ধার মতই আপনার জীবন উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

সানন্দে হাততালি দিয়ে উঠে এষা বলল,—বাঃ কি সুন্দর উপহার দিয়েছেন। ফুলের চেয়ে ভাল প্রেজেন্ট আর কি হতে পারে? রূপকের মুখ রাগে অপমানে কালো হয়ে ওঠে। কিন্তু সে সময় এক এক করে গণ্যমান্য অতিথি অভ্যাগতরা হলঘরে প্রবেশ করায় বিনতা দেবী ও সুবল কর তাঁদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

অনুষ্ঠান শুরু হল। এষা একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইল। "ভরা থাক স্মৃতি সুধায়···"

সুরের রেশে সবাই অভিভূত হয়ে পড়লেন। এষার অনুরোধে হরিপদ "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" আবৃত্তি করে শোনাল। একজন প্রধান অফিসারের স্ত্রী ম্যাজিক দেখালেন। রূপক সারাক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। সে তখন মনে মনে একটা প্ল্যান আঁটছিল।

পার্টি যখন শেষ হল তখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা। সবাই এক এক করে চলে গেল! রইল শুধু রূপক· হরিপদ আর বাড়ির লোকেরা। রূপক মিষ্টি হেসে বলল,—হরিপদবাবু আপনি থাকেন কোথায়?

—রামপুর কলোনীতে।

—ওহ্ রামপুরে। সে তো একেবারে শহরের উল্টোদিকে—মানে পূব থেকে পশ্চিমে। আচ্ছা··· চলুন আমি আপনাকে গাড়িতে একটা লিফ্ট দিয়ে আসি। নইলে এত রাত্তিরে আপনাকে অনেকটা হাঁটতে হবে। এত রাত্রে সাইকেল রিক্সাও পাবেন না। বিনতা দেবী ও এষা দুজনেই রূপকের প্রস্তাবে আশ্চর্য ও পুলকিত হল। কারণ এত রাত্তিরের নির্জন অন্ধকারে হরিপদর পক্ষে অতটা পথ হেঁটে যাওয়াটা নিরাপদ নয়। হরিপদকে নিয়ে রূপক গাড়ি চালিয়ে দিল। সে সোজাসুজি রামপুর কলোনিতে গেল না। পাহাড়তলীর

রাস্তা ধরল। সেই উপবৃত্তাকার মাঠটাকে পাক দিয়ে গাড়ি ঘুরে চলল।

হরিপদ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল,—আপনি এতটা ঘুরে যাচ্ছেন কেন?

—চলুন না একটু বেড়ান যাবে। আপনার সঙ্গে গল্পও হবে। হরিপদ চুপ করে গেল; কিন্তু তার মনে একটা খটকা জেগে রইল।

মাঠটাকে পাক দিয়ে এসে গাড়িটা তুলসী রোড ধরে চলল সোফিয়াবাদের দিকে।

হরিপদ আবার প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল; কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে রূপক বলে, সোফিয়াবাদ ঘুরে মুঙ্গের রোড ধরে আপনাকে রামপুরে পেঁছে দিয়ে আসব। 'জামালপুর— বাই নাইট' দেখব আমরা।

পাহাড়ের টানেলটার গায়ে এসে রূপক গাড়িটা থামাল।

—একি! এখানে গাড়ি থামালেন কেন? হরিপদ সাশ্চর্যে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু সেও রূপককে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। গম্ভীরভাবে পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে রেললাইনের ওপরে দাঁড়িয়ে রূপক বলল,—জানেন হরিপদবাবু এই পাহাড়, নিকষ কালো রাত্রির অন্ধকার, সিলুয়েটের মত আবছা এই শাল শিমুলের জটলাগুলো আমাকে বার বার হাতছানি দেয়। কেন জানিনা আমি এদের দেখলে ছোটবেলায় ফিরে যাই। হরিপদর হাত আকর্ষণ করে সে টানেলটার আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে—জানেন হরিপদবাবু এখন আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে?

—কি? হরিপদ সভয়ে প্রশ্ন করে।

—ছেলেবেলায় আমরা দেওঘরের পাহাড়ের তলায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করতাম। আর আমাদের সেই অর্থহীন চিৎকারগুলো প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসত। আমি এখন তাই করব।

লোকটার মাথায় ছিট আছে নাকি হরিপদ মনে মনে ভাবল কিন্তু তার পরক্ষণেই রূপক তিনবার হুইসিল দিল। পাহাড়ের খাঁজ থেকে একটা হু হু করে শব্দ প্রত্যুত্তরে ভেসে এল। কিছুক্ষণ দুজনে কেউ কোন কথা বলল না। শুধু রূপক চুপচাপ পাহাড়ের উঁচুতে কি যেন লক্ষ্য করতে লাগল। হঠাৎ পাহাড়টার মাঝামাঝি জায়গায় দপ্ করে একটা আলো জ্বলে উঠল। যেন টর্চ লাইটের ফ্ল্যাশ।

—ওটা? ওটা কি···ওটা-কি?···আতঙ্কিত হয়ে হরিপদ চেঁচিয়ে উঠল। দুজনেই সবিস্ময়ে দেখল, যেখান থেকে আলোটা জ্বলে উঠেছিল; সেই

পাহাড়টার আড়াল থেকেই একটা সুন্দরী রমণী নেচে নেচে নীচে নেমে আসছে। তার পরিধেয় বস্ত্র থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মিনিট খানেক সময় থেকে, মূর্তিটা পাহাড়ের গায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

—পালিয়ে চলুন। বলে হরিপদ তার ক্ষীণাঙ্গ নিয়ে দৌড় মারল গাড়িটার দিকে। চারদিক নির্জন। সোঁ সোঁ করে টানেলটার ভেতর থেকে হাওয়া ভেসে আসছে। রেলওয়ে লাইন থেকে দুপাশে অড়হরের ক্ষেত আর চালার বাড়িগুলো অপার্থিব নিঃসঙ্গতা নিয়ে ঝিমাচ্ছে। রূপক যেন একটু হতাশ হয়ে গাড়ির কাছে ফিরে এল।

গাড়িটা স্টার্ট নিতে যাবে, এমন সময় অন্ধকারের বুক চিরে একটা ভিখারী গাড়ির কাছে এসে বলে উঠল,—বাবুজী কুছ পয়সা দিজিয়ে। দো রোজ কুছ ভি নেই খায়া।

এই অন্ধকার রাত্তিরে এভাবে এইখানে ভিখারীটার অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিতে হরিপদর মনটা কেমন যেন বিকল হয়ে গেল। কিন্তু পূর্বেকার রহস্যজনক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সে জিনিষটাকে লঘু করেই দেখল। হরিপদ তার পাঞ্জাবীর পকেট থেকে পয়সা বের করে লোকটাকে দিল। লোকটা—'পহচান লিয়া' ফিস ফিসিয়ে বলে। মুখে একটা ক্রুর হাসির রেখা ফুটিয়ে রূপক সিগারেট ধরায়। গাড়িটা সোফিয়াবাদের দিকে ছুটে চলল।

সোফিয়াবাদ আসতেই গাড়িটার স্পীড কমাল। পুর্ব্বাশা নার্সিংহোমের টিউব লাইট তখনও জ্বলছে।

নার্সিংহোমের গেটের কাছে আসতেই কয়েকটি উত্তেজিত লোকের জটলা দেখা গেল। বাধ্য হয়ে গাড়িটা থামাল রূপক। তাকে দেখে নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে এলেন ডাঃ ব্যানার্জী। তাঁর পিছু পিছু স্থানীয় লোকের জটলা।

—আপনারা কি আসবার সময় পাহাড়ের দিকে আশ্চর্য কিছু লক্ষ্য করেছেন?

—কৈ না তো। থতমত খেয়ে রূপক বলল। কিন্তু তাকে চেপে দিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে হরিপদ বলে ওঠে, হ্যাঁ···হ্যাঁ পাহাড়ের ওপর সেই আলোপরী এই কিছুক্ষণ আগেও আমরা দেখেছি।

—ওহ্! আপনারাও তাহলে দেখেছেন। এ মহল্লার কোন কোন লোকেরা ওই আলো দেখতে পেয়ে আমার কাছে এসেছিল। আমার স্ত্রীও ছাদ থেকে

একটা আলোর ছটা দেখতে পেয়েছেন। অন্ধকার পাহাড়ের বুক চিরে যেন কতকগুলো টর্চলাইট জ্বলে উঠল।

হরিপদ ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে ডাক্তারের সঙ্গে তার পরিচয়ের পর সে বলল, আমরা খুব কাছ থেকে দেখলাম পাহাড়টার ওপর থেকে একজন যুবতী নাচতে নাচতে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

—এ রহস্যের একটা কিনারা হওয়া অবশ্যই উচিৎ। এবার এগিয়ে এসে রূপক বলে।

ব্যাপারটা কিন্তু তখনকার মত সেখানেই চাপা পড়ে যায়।

গাড়িটা আবার মুঙ্গের রোড ঘুরে জামালপুর শহরের দিকে এগিয়ে চলল। রূপককে কিছুক্ষণ উত্তেজিত দেখা যায়, কিন্তু কেউ কোন কথা বলে না। রামপুর কলোনীর পাঁচিলের গেটের কাছে হরিপদকে নামিয়ে দিয়ে রূপক বিদায় নেয়।

[চার]

জায়গাটার নাম রামপুর। জামালপুর শহরের পূব দিকে যেমন পাহাড়, পশ্চিম দিকে সেরকম নাতিবিস্তৃত এক অঞ্চল জুড়ে রামপুরের বিস্তার।

এই রামপুরেরই বেশ কয়েক একর জমি নিয়ে, রেলওয়ের কেরানীদের জন্য কোয়ার্টারগড়ে উঠেছে। জায়গাটার নাম রাখা হয়েছে— রামপুর কলোনী। পাঁচিল দিয়ে কলোনীটার চারদিক ঘেরা। বাইরে থেকে দুর্ভেদ্য মনে হয়। পাঁচিলটার পাশ দিয়ে চলে গেছে একটা লম্বা রাস্তা। সেটা গিয়ে ঢুকেছে রামপুরের বসতিতে।

রামপুরের ঠিক পূর্ব দিকেই জামালপুর রেলওয়ে হাইস্কুল ও রেলওয়ে এ্যাপ্রেন্টিসদের হোস্টেল সীমারেখাটা নিদৃষ্ট করে রেখেছে। স্কুলটার এক পাশে ছেলেদের খেলবার একটা বিরাট মাঠ। মাঠটার বুক চিরে আঁকা বাঁকা পায়ে চলা পথ রামপুরের অপর কিনারে গিয়ে পড়েছে।

রামপুরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই জনই বিহারী ব্রাহ্মণ। স্থানীয় উচ্চারণে সেটা অপভ্রংশ হয়ে বাভন বলে চিহ্নিত হয়ে গেছে।

এই বাভনরা একদিকে যেমন সরল ও সৎ প্রকৃতির, উত্তেজিত হলে আবার কাউকে খুন করতেও দ্বিধা বোধ করে না।

এই বাভনদের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা কিংবদন্তী আছে। রাজা জরাসন্ধ যখন তাঁর রাজসূয় যজ্ঞ শুরু করেন, তখন তাঁর এক হাজার ব্রাহ্মণ ভোজনের প্রয়োজন হয়। এক হাজার ব্রাহ্মণ যোগাড় করতে না পেরে, রাজা মহা ফাঁপরে পড়লেন। কুলপুরোহিতের আদেশে, তিনি তখন রাস্তা থেকে ধরে আনা অতিথিদের ব্রাহ্মণ করে নিয়ে তাঁদেরকে ভোজন করিয়ে তাঁর যজ্ঞ সমাধা করলেন। এইসব ভুঁইফোড় ব্রাহ্মণদের নাম হল ভূমিহার বা ভুঁই-হার বাভন।

রামপুরের এক আটচালার বারান্দায় খাটিয়া পেতে ভোরের মিষ্টি আলোয় বসে বসে জন কয়েক বাভনদের মধ্যে কথা হচ্ছিল। এরা সবাই ডাকাত শ্রেণীর। পূর্বোক্ত পাহাড় পরীর দলের।

—আমাদের উপার্জন আজকাল বড় কমে গেছে। উচিৎ সিং বলে।

—কি করে হবে? আগেকার মত দল বেঁধে তো আর আমরা ডাকাতি করতে যেতে পারি না। কেবল সিং উত্তর দেয়।

—আইন বড় কড়া হয়ে গেছে। অবোধরাম হতাশ সুরে বলে।

—আচ্ছা, মুঙ্গেরের সেই অফিসারবাবু আমাদের যে মোটা রুপেয়া দিবেন বলেছিলেন, তার কি ব্যবস্থা হল? কেবল সিং প্রশ্ন করে।

—আরে হোবে হোবে। আগাম টাকা তো আমাদের দিয়েছেন। লোকটাকেও চিনে নিয়েছি। এখন আর একবার পাহাড়ের ধারে এলেই হয়। লাঠির ঘা দিয়ে কাজ হাসিল করে বাকী টাকাটা আদায় করব। উচিৎ সিং বলে।

—আচ্ছা সেই টাকার তো হিস্যা হল না। কেবল সিং বলে।

—আরে হোবে হোবে। সব টাকাটা আগে পাই। তারপর হিস্যা আমি তোমাদের বুঝিয়ে দেব।

—তারপর কিছুক্ষণ থেমে উচিৎ সিং বলে—কেবল, তোমার উপরেই আমি এই কাজের ভার দিলাম। তুমি ওই বাঙ্গালী বাবুকে খতম করে দেবে। তারপর কাজ শেষ হলে, পাহাড়ে উঠবে না।—সোজা এখানে চলে আসবে। এখানে সেই রাত্তিরেই আমাদের টাকা পয়সার হিস্যা হবে।

তারপর সর্বসম্মতি ক্রমে ঠিক হল কেবল সিং হরিপদকে নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট জায়গায় খুন করে সোজা রামপুরের ডেরায় চলে আসবে। উচিৎ সিং রূপকের কাছ থেকে বাকী টাকা আদায় করবে। তারপর উচিৎ সিংও রামপুরে চলে আসবে। ডেরায় এসে তাদের পাওনা হিসাব সে রাত্তিরেই ঠিক হবে।

পাঞ্জাবী ছেলে উজ্জ্বল সিং সে রাত্রে পাহাড়েই থাকবে। আর অবোধরাম ও অন্যান্য দুজন অনুচর হরিপদর দেহটাকে পাহাড়ের ভেতরকার একটা খাদে ফেলে দিয়ে আসবে।

সব ঠিকঠাক করে উচিৎ সিং বলল, আমি এখন মুঙ্গেরের অফিসার বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে তারিখ আর সময়টা ঠিক করে নিই।

* * *

মুঙ্গেরের গঙ্গার ধারে সিগারেট ফ্যাক্টরিতে একলা নিজের ঘরে একটা সোফার ওপর গা এলিয়ে জুনিয়র অফিসার রূপক রায় চৌধুরী আকাশ পাতাশ ভাবছিল। তার চোখের সামনে এষার কমনীয় মুখখানি ভেসে উঠছিল। ক্ষীণ কলেবর স্মিত হাস্য মুখ হরিপদ কেরানীর ছবিটা মনে আসতে অসহ্য হয়ে উঠছিল তার দেহমন। না—এভাবে চলে না। আর এষার রুচিকেই বলিহারি যাই। কি পাবে সে ওই হাড্ডি সার চেহারার কেরানীর কাছ থেকে। ধন, মান, যৌবন সবই তার বিফলে যাবে। মনে মনে রূপক ঠিক করল তার পথের কাঁটা সেই পাহাড়ের গুণ্ডাদের দিয়ে সরাতে হবে।

মুঙ্গের রোড ধরে জামালপুরের দিকে গাড়ি ড্রাইভ করে চলেছে রূপক রায় চৌধুরী। সোফিয়াবাদের মোড়ে মুঙ্গের রোড ছেড়ে ডি. ডি. তুলসী রোড ধরল গাড়িটা। সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকার তখন পাতলা ওড়নার মত চারদিক ছেয়ে ফেলছে। টানেলটার কাছে এসে গাড়ি থামায় রূপক। গোঁ গোঁ করতে করতে একটা ট্রেন চলে গেল। রেললাইনের উপর উঠল রূপক।

তারপর পূর্বদিকের টানেলটার দিকে এগিয়ে চলল। ট্রেন থেকে সদ্য নামা দুচারজন যাত্রী বিস্মিত ও কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। রূপক বুঝতে পেরে একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করল ফুটো পাহাড়টা এদিকে তো ভাই। আমি একবার ভেতরটা দেখতে যেতে চাই। মুঙ্গেরে থাকি। জামালপুরে বেড়াতে এসেছি।

—হাঁ, হাঁ, এহি রেললাইন পকড়কে সিধা পাহাড়কী তরফ চলা যাইয়ে।

ফুটো পাহাড়টার নীচে দাঁড়িয়ে আবার তিনবার হুইসল বাজাল রূপক। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাগড়ী মাথায় একজন পাহাড়ী তার পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, বাবুসাব, হুশিয়ার। চারদিকের লোকেরা আপনাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করেছে।

কে? ভয় পেয়ে চমকে উঠল রূপক।

—ঘাবড়াবেন না বাবুসাব্। আমি উচিৎ সিং।

—ওহ্ হো তোমার ছদ্মবেশটা আমি ধরতে পারিনি। রূপক সহাস্যে বলে ওঠে। তারপর তাদের শলা পরামর্শ অনুযায়ী ঠিক হয়, পরের রবিবারের রাত্তিরে হরিপদকে রূপক গাড়ি করে পাহাড়ের ধারে নিয়ে আসবে। উচিৎ সিং -এর লোকেরা তখন তাদের কাজ সুবিধামত হাসিল করবে। রূপকের কাছ থেকে সে রাত্তিরেই তারা বাকী টাকাটা নিয়ে নেবে। মাথায় প্ল্যান এ'টে রূপক সেখান থেকে সোজা চলল এষাদের বাড়িতে। তাকে দেখে এষার মা বিনতাদেবী খুব খুশী। এষার মেজাজ সেদিন ভাল ছিল। তার কারণ সে রাত্তিরে রূপক হরিপদকে লিফট দেওয়ায় এষার রূপক সম্বন্ধে বিরূপ ধারণাটা দূর হয়ে গিয়েছিল।

একগাল হেসে বিনতাদেবী বললেন, তুমি যে আজকে আসবে আমি ভাবতেই পারিনি।

—না মাসীমা আজকে আমার আসার কথা ছিল না। কিন্তু আমাদের ম্যানেজার মিঃ উইলসনকে জামালপুর স্টেশনে পে'ছাতে এসেছিলাম। তিনি দানাপুর ফাস্ট' প্যাসেঞ্জারে কলকতায় চলে গেলেন।

—ওহ্··তুমি যে কত লোকের উপকার কর। বিনতা দেবী হাসতে হাসতে বলেন।

—সবাই কি আর সেকথা বোঝে মাসীমা। একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অপাঙ্গে রূপক এষার দিকে তাকায়। এষার মুখে একটা চিন্তার ছায়া নামে। সেটা রূপকের চোখে পড়ে না।

হাসতে হাসতে রূপক এক সময় বলে ওঠে, চলুন মাসীমা আমরা পাহাড়ের দিক থেকে একবার হাওয়া খেয়ে আসি।

তোমরা দুজনেই যাও বাবা—কর্তা এখনই অফিস থেকে ফিরবেন। তার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

এষাকে নিয়ে রূপক গাড়িতে স্টার্ট দেয়। কি জানি কেন এষা আর দ্বিরুক্তি করে না। পাহাড়ের কাছে সেই উপবৃত্তাকার মাঠটা পাক দেবার সময়, রূপক গাড়িটা থামিয়ে বলে—চলুন মিস কর. পাহাড়ের তলা থেকে একটু ঘুরে আসি। এষা আপত্তি জানায় না। দু'তিন মিনিটের রাস্তা পেরোতেই পাহাড়ের তলদেশে এসে পে'ছাল তারা। সেখান থেকে খাঁজে খাঁজে কাটা পাথরের সি'ড়ি পাহাড়ের উপর উঠে গেছে, একটা কালী মন্দির পর্যন্ত। চারপাশে

তেঁতুল, অশ্বত্থ আর পিপুল গাছ? মাঝখানে মাটির উঁচু টিলা। তার ওপাশে পাহাড় স্নাত বর্ষার জলে ভরা একটা নাতিবৃহৎ খাল। খালটার পশ্চিম দিকে একটা সুদৃশ্য জলাধার।

সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে তারা পাহাড়ের ওপরে উঠল। পশ্চিমের আকাশে তখন অস্তসূর্যের রঙীন আলো মেঘে মেঘে প্রতিহত, প্রতিফলিত হয়ে আবিরের ফোয়ারা তুলেছে। কিছুক্ষণ সেদিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে এষা বলে —জানেন রূপক বাবু, এই সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত আমরা রোজই দেখি, তবু আমাদের রোজই ভাল লাগে, রোজই মনে হয় নতুন দেখছি একটা মিষ্টি ছবি। রূপক এষার কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলেন।

—মিস্ কর তার কারণ কি জানেন?

—কি?

—তার কারণ আপনার চোখটাই মিষ্টি। আপনার মনটাই মিষ্টি।

পশ্চিমের আবিরগোলা আকাশের রক্তাভা বুঝি এষার গণ্ডদ্বয় স্পর্শ করল।

পাহাড়ের পাথরের খাঁজে খাঁজে নাম না জানা বুনো ফুল ফুটেছিল। তাই দেখে হাততালি দিয়ে এষা বলল, কি চমৎকার বলুন। নীরস পাহাড়ও ফুল ফোটাতে জানে। রূপক তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে এক গোছা মেরুন্ রং-এর জংলী ফুল তুলে এনে এষার খোঁপায় গুঁজে দেয়, এষা চমকে উঠে আশে পাশে তাকায়; কিন্তু আপত্তি জানায় না।

—আরে ওই বেদীর কাছটায় কে বসে আছে? এষা সচকিত হয়ে বলে ওঠে।

রমন্দিরটার মাঝ পথে কোন রসিক লোক একটা গাবগাছের তলায় বসবা জন্য সিমেণ্টের বেঞ্চ করে দিয়েছিলেন। তার ওপরে একজন কেউ বসে ওদের লক্ষ্য করছিল! এষা লাফিয়ে লাফিয়ে সেদিকে এগিয়ে যায়। মূর্তিটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

এষা সাশ্চর্যে চেঁচিয়ে ওঠে—হরিপদ বাবু!!…আপনি এখানে?—এসময়ে?

শান্ত হেসে হরিপদ উত্তর দেয়—আপনারা বোধ হয় জানেন না আমি প্রায়ই সন্ধ্যাতে এই পাহাড়ের ধারে বসে বসে দেখি, জড় আর জীবনের সৌন্দর্যকে। শুধু পাখির গান যে আমি শুনি তা নয়, প্রকৃতির ডাকও আমি শুনতে পাই।

—আপনার কবিত্ব রাখুন হরিপদ বাবু, চলুন আমাদের সঙ্গে।

রূপকের মুখে একটা কালো মেঘ নেমে আসতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত একটা হাসিতে সেটা ঢাকা পড়ে যায়। হাসতে হাসতে রূপক বলে —হরিপদ বাবু আপনি কবি, মিস্ কর গায়িকা, এতগুণ আপনাদের ভগবান দিয়েছেন। আমার সে সব কিছুই নেই; কিন্তু আমার একটা নেশা আছে জানেন।

—আপনার আবার কি নেশা? খিল খিল করে হেসে এষা বলে—মেয়েদের মন জুগিয়ে চলা।

চতুর রূপক ধাক্কাটা সামলে নিয়ে বলে, না মিস্ কর। আমি ফটো তুলতে ভালবাসি। জীবনে অনেক ফটো আমি তুলেছি, কিনেওছি। আমার কতক-গুলো রঙীন ফটো স্লাইড রয়েছে। আমার প্রস্তাবে আপনারা যদি রাজী থাকেন তো, আগামী রবিবার সন্ধ্যায় একটা ঘরোয়া পরিবেশে মিস্ করের বাড়িতেই আমার পকেট প্রোজেকটার এনে স্ক্রিনের ওপর সেই কর্নাড স্লাইড-গুলো মেলে ধরব। আর সেই সঙ্গে হরিপদ বাবুর স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি ও মিস করের গানও হবে। আমাদের এই জমায়েতে বাইরের লোক আর কেউ থাকবে না।

—সাধু সাধু!…অত্যন্ত সুন্দর প্রস্তাব আপনার রূপক বাবু। আপনার ভেতরে যে একটা কচি মন লুকিয়ে আছে বাইরে থেকে দেখলে সেটা বোঝা যায় না। হরিপদ বাবু বলে ওঠে।

রূপকের প্রস্তাবে এষাও অভিভূত হয়ে সায় দেয়।

*   *   *

রবিবারের সন্ধ্যা। জামালপুর প্রিন্সেস স্ট্রীটে কর সাহেবের বাংলোয় সেদিন আর একটা মজলিস বসেছে। মেঝেতে ছোট্ট ফরাস পাতা। তাতে বসে আছেন কর দম্পতি আর চুপচাপ এষা ও হরিপদ। তাদের মাথার পেছনে একটা টুলের ওপর প্রোজেকটার বসিয়ে রূপক স্লাইড দেখিয়ে যাচ্ছে। বেশীর ভাগই নয়নাভিরাম দৃশ্য। রূপক ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় ঘুরেছে। সেইসব ছবি। সবাই ফটোগুলোর খুব প্রশংসা করলেন. এষার সুরেলা গানও সকলের হৃদয়ে ঝংকৃত হতে থাকল। হরিপদর স্বরচিত কবিতার আবৃত্তি শুনে রূপক প্রচুর হাততালি দিলেন। অভিভূত কণ্ঠে বলে উঠলেন—হরিপদ বাবু আপনার যা প্রতিভা আছে তাতে চর্চা করলে আপনি রবীন্দ্র

নাথ হতে পারবেন। প্রশংসা শুনতে ভাল লাগলেও হরিপদ লজ্জা পেয়ে বলে আমাকে এত উঁচুতে তুলে গুরুদেবকে ছোট করবেন না।

সভা যখন ভাঙ্গল তখন রাত্তির নটা। কিন্তু ছোট জামালপুর শহরে তখনই ঘুমের আমেজ নেমেছে।

পূর্ব রাতের মত হরিপদকে রূপক লিফট্ দেয়। গাড়িটা আবার মাঠটাকে পাক দিয়ে ঘুরে ডি· ডি· তুলসী রোড ধরে সোফিয়াবাদের পথ ধরে।

—রূপকবাবু আপনি কি একই চক্রে ঘুরতে ভালবাসেন?

—তার মানে?

—মানে সোজা, গতবার আপনি অহেতুক এ রাস্তা দিয়ে ঘুরে সোফিয়াবাদ হয়ে রামপুর গেলেন। এবারও সোজা রাস্তা ছেড়ে দিয়ে সেই ঘুর পথেই যাচ্ছেন দেখছি।

—সোজা রাস্তায় তো সকলেই চলে। আমার মত ঘুরপাক খেতে আর কজন ভালবাসে বলুন।

এবার হরিপদ একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠে; কিন্তু দেখবেন ব্যাপারটা যেন ঘোরাল না হয়। গতবারের অভিজ্ঞতা মনে আছে তো? সেই পাহাড়ের পরী?

—দূর ওটা আমাদের চোখের ভুল।

—চোখের ধাঁধা নয় রূপকবাবু। ধাঁধা খাবার মত লোক ডাঃ চপল ব্যানার্জী নন। তিনি এ ব্যাপারটা বিশ্বাস করেন।

—ব্যাপারটা তাহলে রহস্যজনক। রূপক গম্ভীরভাবে বলে ওঠে।

গাড়িটা তখন ফুটো পাহাড়ের রেললাইনের তলায় এসে দাঁড়িয়েছে। একটা সজনে গাছের তলায় গাড়িটা পার্ক করে রূপক বাইরে বেরিয়ে আসে।

ভয়ার্ত স্বরে হরিপদ বলে ওঠে, আমাকে আর টানাটানি করবেন না রূপক বাবু। পরীতে আমি বিশ্বাস করি না; কিন্তু আমার বিশ্বাস এ কোন বদমাইস লোকের কাজ।

হরিপদকে গাড়ির বাইরে টেনে এনে কঠিন কণ্ঠে রূপক বলে, তাহলে আমাদের অন্ততঃ উচিৎ নয় কি সেই বদমাইসদের খুঁজে বার করা? আসুন হরিপদ বাবু আমারা এই রহস্য ভেদ করব।

আমি পুলিশ বা সি· আই· ডির লোক নই মিঃ রায় চৌধুরী। আমাকে ছেড়ে দিন।

কিন্তু হরিপদকে এক রকম টানতে টানতেই কালভার্ট পেরিয়ে, টানেলটার মুখের কাছে রূপক নিয়ে আসে।

চারদিকের অন্ধকারটা যেন অবিশ্বাস্য রকমের কালো মনে হচ্ছে। গাছ পালাগুলো দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। ভূতুড়ে হাতের মত একটা বটগাছের ঝুরি নেমেছে।

—এত ঘুট ঘুটে অন্ধকার যে, হরিপদ শিউরে ফিসফিসিয়ে ওঠে।

হ্যাঁ আজ অমাবস্যার রাত। রূপক ব্যাঙ্গোক্তি করে ওঠে।

রূপক হুইসিলটা সবে মুখে লাগিয়েছে এমন সময় হরিপদ কঁকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে ওটা···ওটা কি?

পাহাড়ের তলদেশ থেকে একটা বীভৎস অন্ধকার মূর্ত্তি ছুটে এগিয়ে আসে তাদের দিকে। হরিপদ ছুটে পালাতে যায়; কিন্তু রূপক তার হাত চেপে ধরে।

—মিঃ রায় চৌধুরী! আপনি! ওহো ঃ······।

হাঃ হাঃ করে রূপক হেসে ওঠে। আর সেই বীভৎস মূর্ত্তিটা পালাবার আগেই হরিপদকে একটা ছোরা মারে। ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য হরিপদর পিঠে ঢুকে যায় সেটা। হরিপদ মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। তার তীব্র আর্তনাদে চারদিকের আকাশ বাতাস ভরে যায়। ছোরাটা পিঠ থেকে তুলে তার বাঁট দিয়ে পুনরায় মাথায় আঘাত করে আততায়ী।

—শালা মর গিয়া। আততায়ীটি বলে ওঠে। তারপর রূপকের মুখের দিকে চেয়ে বলে রূপিয়া লাইয়ে সাব কাম খতম।

টাকাটা তো উচিৎ সিংকে দেওয়ার কথা? রূপক অস্ফুট গলায় বলে। না। সে আজ থাকবে না। মূর্তিটা বলে। রূপক তার হাতে নোটের বাণ্ডিলটা গুঁজে দেয়। তারপর রেললাইন ধরে ছুটে চলে তার গাড়ির দিকে।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বিধ্বস্ত রূপক মুঙ্গেরের দিকে এগিয়ে যায়। ঠিক সেই সময় বিপরীত দিক থেকে আসা আর একটা গাড়ির তীব্র হেডলাইটে রূপকের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। সে গাড়িটা নীচের গিয়ারে নামিয়ে দেয়। ইঞ্জিনটা গরর্ গরর্ করে চলে। অন্য গাড়িটা থেকে নেমে আসেন ডাঃ চপল ব্যানার্জী। রূপকের দিকে এগিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করেন—মিঃ রায়-চৌধুরী, এদিক থেকে একটা করুণ চিৎকার শুনতে পেলাম। মনে হল যেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।

—না, কই না তো। অপ্রকৃতিস্থর মত রূপক চেঁচিয়ে ওঠে। রূপকের

অসংলগ্ন কথাবার্তা ও বিধ্বস্ত চেহারা, ডাক্তারের চোখ এড়ায় না। কিন্তু তিনি রূপককে ছেড়ে দিয়ে ফুটো পাহাড়টার দিকে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চললেন।

রেল লাইনের তলাকার ব্রীজটার নীচে, গাড়ির হেড লাইটে-ডাক্তারের চোখে পড়ল, ডান পাশে সজনে গাছটার নীচে একটা রুমাল পড়ে রয়েছে। এ জায়গায় এভাবে রুমাল পড়ে থাকাটা তার চোখে অস্বাভাবিক ঠেকল। সে জন্য ডাঃ ব্যানার্জীর ড্রাইভার বিষেণ সিংকে গাড়ি থামাতে বললেন। জোরাল টর্চের আলোয় সজনে গাছটার তলায় গাড়ির চাকার দাগ দেখে ডাক্তার বুঝলেন এখানে একটা গাড়ি কিছুক্ষণ থেমেছিল। রুমালটা থেকে এসেন্সের গন্ধ বেরোচ্ছিল। তার এক কোণে 'আর' লেখা ছিল। ডাক্তার বুঝলেন এটা রূপকের রুমাল। কিছুক্ষণ আগে তার জামা থেকে ভেসে আসা এরকম এসেন্সের গন্ধ তিনি পেয়েছেন।

…কিন্তু কেন? কেন রূপক তাকে এড়িয়ে গেল? আর কেনই বা সে অত ভয় পেয়ে গেল? তবে কি রূপকের সঙ্গে পাহাড়ে পরীর কোন সম্পর্ক আছে?

ড্রাইভার বিষেণ সিং গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলল,—এতনা কেয়া নজর করতে হো ডাগদার সাব?

ডাক্তার উত্তরে রুমালটা তুলে বিষেণ সিংকে দেখালেন। বিষেণ সিংও খুব আশ্চর্য হয়ে বলল, মেরে খেয়াল মে হিয়া খুন খারাপি কুছ হুয়া হ্যায়। ওহি বাবুকো ভি ইয়ে মালুম হ্যায়।

—ঠিক বলেছ বিষেণ সিং।

হঠাৎ ডাক্তারের মনে হল মাথার ওপরকার রেল লাইনের কিনারা থেকে একটা পোড়া গন্ধ আসছে। কালভার্টের ওপর দিয়ে রেল লাইন চলে গেছে। তলা দিয়ে মোটর গাড়ি যাবার রাস্তা। রেল লাইনের এক দিকে পাহাড় ও টানেল, অন্য দিকে প্রায় পৌনে এক মাইল দূরে জামালপুরের রেলওয়ে স্টেশন।

খাড়াই বেয়ে বেয়ে ডাক্তার আর বিষেণ সিং ওপরের রেললাইনের ওপর ওঠে এল।

—ওই দেখ বিষেণ!

ডাক্তারের অঙ্গুলী নির্দেশে বিষেণ দেখতে পায় একটা অর্ধদগ্ধ সিগারেটের টুকরো তখনও জ্বলছে। রেললাইনের পাশের ঘাস জাতীয় আগাছাগুলো ও পড়ে থাকা খড়কুটো তার সংস্পর্শে এসে জ্বলছে।

এমন সময় একটা অস্ফুট কাতরানির শব্দ তারা দুজনেই শুনতে পায় ফুটো পাহাড়টার দিক থেকে আসছে। ডাক্তার দ্রুত পায়ে সেদিকে এগিয়ে যান। বিষেণ সিং তাঁকে অনুসরণ করে।

টানেলটার কাছে পাহাড়ের তলদেশে একটা খাঁজের মধ্যে ডাক্তার দেখতে পান মুখ থুবড়ে কে একজন বড় পাথর আঁকড়ে পড়ে রয়েছে। জোরালো টর্চের আলোয় তার মুখটা দেখতে পেয়েই ডাক্তার চমকে ওঠেন, সেই হরিপদ বাবু। নাড়ী ধরে পরীক্ষা করে দেখে বোঝেন, তখনও তার দেহে প্রাণ রয়েছে। হরিপদ বাবু যদিও অচেতন। বাহ্যজ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত। রক্তে চারদিক ভেসে যাচ্ছে। চকিতে ডাক্তার ব্যানার্জী ক্ষতস্থানটা চেপে ধরে তার রুমালটা সেখানে গুঁজে দেন। তারপর হরিপদর জামাটা খুলে সেই ক্ষতস্থানের ওপর চেপে বাঁধেন। রক্তপড়া তাতে বন্ধ হয়।

ডাক্তার মনে মনে ভাবেন রূপকই নিশ্চয় কোন কারণে হরিপদকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। বিষেণ সিং আর ডাঃ চপল ব্যানার্জী দুজনে ধরাধরি করে হরিপদকে গাড়ির দিকে নিয়ে যেতে থাকে। টর্চটা বগলে গুঁজে রাখেন ডাক্তার। হঠাৎ একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে ডাঃ ব্যানার্জী সামলে নিলেন; কিন্তু তার টর্চটা নীচের খাদের জঙ্গলে পড়ে যায়।—যাঃ পড়ে গেল বলে ওঠেন ডাঃ ব্যানার্জী কালভার্টের গা বেয়ে বেয়ে আবার তারা নেমে আসে গাড়ির কাছে।

নির্জন রাস্তাটা ল্যাম্প পোস্টগুলোর ক্ষীণ আলো বিকীরণ করে চলেছে। দুপাশের বাবলা গাছগুলো হাওয়ায় সির সির করে কাঁপছে। ডাঃ ব্যানার্জী বিষেণ সিংকে সোজা ড্রাইভ করতে বললেন নার্সিংহোমের দিকে। যদি হরিপদকে বাঁচান যায়।

[পাঁচ]

রাত তখন দশটা। রামপুরের একটা চালা ঘরের কুঠুড়িতে খাটিয়া পেতে বসেছিল উচিং সিং আর তার দলবল। তারা প্রত্যাশা করেছিল কেবল সিংয়ের।

রাত তো অনেক হয়ে গেল এখনও কেবল এল না তো? অবোধরাম বলে।

—আসবে, আসবে। কাম হাসিল কোরবে টাকাটা লিবে—তারপর পাহাড়সে রামপুরে আসবে দু-মাইল রাস্তা। সোময় তো কুছ লাগবে।

বলতে বলতে কেবল সিং হুড় মুড় করে ঘরে ঢোকে। তারপর সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে···কাম ফতে।

সাবাস···, সাবাস···সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে।

—রুপেয়া মিলেছে তো? উচিৎ সিং জিগ্যেস করে।

—মিলেছে। টাকাটা সামনে মেলে ধরে কেবল সিং। ঘরের এক কোণে লম্পর আলো জ্বলছিল। তার লম্বা শিখাটা দপদপ করছিল। দেওয়ালে লোকগুলোর ছায়া দুলছিল। সেই আলোতে উচিৎ সিং গুনল, কথা মত পুরো টাকাই রয়েছে।

উচিৎ সিং টাকাটা পকেটে পুরতে যায়; কিন্তু কেবল তার হাত ধরে বলে হিস্যাটা এখনই হয়ে যাক, সর্দার।

উচিৎ চটে আগুন হয়ে গেল। সে বলে— হাত ছাড়, কেবল। কালকে আমি হিস্যা করব।

—কাল নয় আজ এখনই হিস্যা চাই।

···কি রকম হিস্যা তুই চাস? উচিৎ জিজ্ঞেস করে।

—সমান সমান বখেড়া।

—সমান সমান! উচিৎ যেন আকাশ থেকে পড়ে। এই নে বলে কিছু টাকা উচিৎ ধরিয়ে দেয়। এর বেশী আর পাবি না তুই।

কেবল সিং ক্ষেপে যায়। কাম হাঁসিল করলাম আমি আর টাকাটা লিবে তুমি?

অবোধ টাকাটা চারজনের মধ্যে সমানভাবে ভাগাভাগির প্রস্তাব দেয়।

—থাম তুই অবোধ। আমি দলের সর্দার, আমি ওই অফিসার বাবুকে বলে সব ঠিক করেছিলাম। আমি বলছি তোরা দুজন বেশী পাবি না।

—খবরদার তা হবে না! বলে কেবল উচিৎ এর পকেটের দিকে হাত বাড়ায়।

—তবে রে শয়তান! বলে উচিৎ পকেট থেকে তীক্ষ্ণ ছুরিটা বার করে কেবল সিং-এর কনুইয়ে সজোরে ঢুকিয়ে দেয়।

—উঃ বলে কেবল সিং পিছিয়ে আসে। ছুরিটা মাটিতে পড়ে যায়। ক্ষোভে প্রতিহিংসায় কেবল, উচিৎকে আক্রমণ করে। দু'জনে ধস্তাধস্তি চলে। অবোধ রাম একপাশে সরে দাঁড়িয়ে দুজনের মারামারি দেখতে থাকে। হঠাৎ ছুরিটা হাতে পেয়ে কেবল সিং উচিৎ-এর পেটে বসিয়ে দেয়।

—আঃ···বলে বিকট চিৎকার করে ওঠে উচিং। ধস্তাধস্তিতে লম্পটা মাটিতে পড়ে যায়। খাটিয়ার কোণে জড় করা চাদরে আগুন ধরে যায়। কেবলকে উচিং সে আগুনের মধ্যে ঠেসে ধরে ; কিন্তু বেশীক্ষণ চাপতে পারে না। কারণ ছুরির আঘাতে সে অবসন্ন হয়ে গিয়েছিল। কেবলের মুখ, হাত আগুনে জ্বলে যায়। যন্ত্রণায় সে চিৎকার করে বাইরের দরজা দিয়ে পালিয়ে যায়। ছুটে বাইরের রাস্তায় আসে।

আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। চারদিকে ভয়ার্ত চিৎকার, লোকের ছোটাছুটি। কেবল সিং উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে থাকে। তাকে কেউ লক্ষ্য করে না।

রামপুর থেকে বেরিয়ে এসে সে কিন্তু পিচ বাঁধা রাস্তায় নামে না। ধানক্ষেত পেরিয়ে কোণাকুণিভাবে কেবল সিং সোজা সোফিয়াবাদের দিকে দৌড়তে থাকে। এ জায়গায় কোন পায়ে হাঁটা রাস্তা নেই। শুধু ধান আর অড়হরের ক্ষেত। মরিয়া হয়ে কেবল, মুন্সের রোডের দিকে ছুটতে থাকে! মাইল খানেক দৌড়ানোর পরে সে ধানক্ষেত টপকে, নালা ডিঙিয়ে, একটা বটগাছের তলায় এসে পেঁছায়। মুন্সের রোড এসে গেছে। তার শরীরে তখন দারুণ জ্বলুনির ব্যথা আর অসহ্য জলতেষ্টা।

তখন তার মাথায় চিন্তা এল, একটা ডাক্তারখানায় সর্বপ্রথম যেতে হবে। কিন্তু কোথায় ডাক্তারখানা? ···চকিতে তার মাথায় এলো—সোফিয়াবাদের পূর্বাশা নার্সিং হোমের কথা। আর মাত্র দু'শ গজ দূরেই সোফিয়াবাদ। রাত তখন কটা সে জানে না। কিন্তু তার শরীর আর বইছিল না। সে পড়িমরি করে নার্সিং হোমের দিকে ছুটল।

*　　　*　　　*

পূর্বাশা নার্সিং হোমে তখন আলো জ্বলছে। যদিও বাইরে কবরের নিস্তব্ধতা। অর্ধচেতন হরিপদকে গাড়িতে করে নার্সিং হোমে এনে সোজা অপারেশন থিয়েটারে এসে ঢোকেন ডাঃ চপল ব্যানার্জী। বিষেণ সিংকে ডেকে ডাক্তার সতর্ক করে দিলেন, এ ঘটনার কথা, ঘুণাক্ষরেও যেন বাইরে প্রকাশ না পায়। পূর্বাশাকে ডাক্তার ডেকে পাঠান। তাকে পুরো ঘটনাটা খুলে বলেন। শুনে পূর্বাশা স্তব্ধ হয়ে যায়। রূপককে সে জানে কিন্তু তিনি একজন উচ্চশিক্ষিত লোক হয়ে এরকম জঘন্য কাজ করবেন তা সে ভাবতে পারেনি।

—কিন্তু পাহাড়ে পরীর সঙ্গে এই হীন আক্রমণের সম্পর্ক কি তা তো পরিষ্কার হল না ? পূর্ব্বাশা প্রশ্ন করে।

—সেটা পরের কথা পূর্ব্বাশা, আগে একে বাঁচাই। নাড়ীটা কত ক্ষীণ দেখ। একটা কোরামিন ইনজেকশন দিয়ে চপল বলে ওঠেন ।

—ব্লাড প্রেসার রেকর্ড করা যাচ্ছে না। ব্লাড প্রেসার যন্ত্রের কাফ্ খুলতে খুলতে পূর্ব্বাশা বলে—

—হ্যাঁ, অনেক রক্তক্ষরণ হয়েছে। একে এখনই রক্ত দেওয়া দরকার। বিচলিত কণ্ঠে চপল বলে ওঠেন।

প্লাজমার বোতল চালিয়ে দেওয়া হল।

এমন সময় বাইরে থেকে বিষেণ সিং এসে ডাকে।

—ডাগদার সাব্, বাহারমে দুসরা এক মরিজ আঁয়া।

—এখন ওকে যেতে বল। ডাঃ ব্যানার্জী অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলেন।

—হাম মানা কিয়া লেকিন শুনা নেই।

চপল বাইরের বসবার লাউঞ্জে এসে ঢুকতেই অর্ধদগ্ধ কেবল সিং তাঁর পায়ের ওপর পড়ে বলে, ডাগদার সাব্ হামকো বাঁচাইয়ে। আগমে জ্বল গিয়া। হায়রে বাপ···বলেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।

ডাঃ ব্যানার্জী ও বিষেণ সিং আবার সেই অচেতন কেবল সিংকে ধরে অপারেশন থিয়েটারের আর একটা টেবিলে তুলে দিলেন।

—এ আবার কি ? এ যে মেডিক্যাল কলেজের ইমারজেন্সি ওয়ার্ড হয়ে গেল দেখছি। সাশ্চর্যে পূর্ব্বাশা প্রশ্ন করে।

কেবল সিংকে পরীক্ষা করতে করতে চপল বলেন আগুনে পুড়ে গেছে লোকটা ; কিন্তু এর অবস্থা হরিপদর মত খারাপ নয়।

···হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত চপলের মাথায় একটা চিন্তা খেলে যায়। তিনি সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠেন, ইউরেকা !··· ইউরেকা !···

—কি হল ? অবাক হয়ে চপলের মুখের দিকে পূর্ব্বাশা তাকিয়ে থাকে। তার স্বামীকে এতটা উত্তেজিত হতে সে আগে কখনও দেখেনি।

পূর্ব্বাশা,—জান আজ আমি জীবনে একটা দারুণ সুযোগ পেয়েছি। আমার সারাজীবনের স্বপ্ন ছিল মানুষের মস্তিষ্ক বদল করে তাকে নবজীবন দান করি। আমি ভিয়েনাতে নিউরোসার্জারি নিয়ে এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করেছি। আমরা নিউরোসার্জেনরা দেখেছি মস্তিষ্কের টিউমারে, মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে,

করোটির ওপর আঘাতে কি ভাবে মানুষের জীবন পঙ্গু ও ধ্বংস হয়ে যায়। সেজন্য আমরা চেষ্টা করেছিলাম মানুষের মস্তিষ্ক যদি বদলান যায় তাহলে তাকে বাঁচান সম্ভব হতে পারে। ভিয়েনার সার্জেন ভনলিংডেনার এ বিষয়ে আমার মন্ত্রদাতা ও পথিকৃত। আমরা কিন্তু ব্যাপারটায় সফল হতে পারিনি।

আজ আমার সামনে দৈবপ্রেরিত হয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে মুমূর্ষু হরিপদবাবু। যার বাঁচার কোন সম্ভাবনাই নেই—আর অজ্ঞাত পরিচয় অর্ধদগ্ধ এই বিহারী যুবক।

হরিপদ বাবুর মস্তিষ্ক— আমি এই বিহারী যুবকের করোটিতে সংযোজন করে সার্জারির ইতিহাসে একটা যুগান্তকারী আলোড়ন আনব।

শিউরে উঠে পূর্বাশা জিজ্ঞাসা করলেন,—কিন্তু এই পোড়ালোকটাকে তো আমরা বাঁচাতে পারি।

—না সে সম্ভাবনাও ক্ষীণ। আমি একে পরীক্ষা করে বুঝতে পারছি চোট লেগে এর মস্তিষ্কেও রক্তক্ষরণ হয়েছে। সেজন্যই এ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, কিন্তু মস্তিষ্ক ছাড়া দেহের অন্যান্য দরকারী যন্ত্রগুলো যেমন হার্ট, লাংস, কিডনী ইত্যাদি খুব ভাল ভাবেই কাজ করছে। অপরদিকে হরিপদবাবুর হার্টটা জখম হওয়ার জন্য বাঁচবার আশা নেই। এই পরিস্থিতিতে আমি এ পোড়া লোকটার মস্তিষ্কটা বাদ দিয়ে যদি সেই করোটিতে হরিপদবাবুর অক্ষত ও সতেজ মস্তিষ্ক সংযোজন করতে পারি তাহলে এ লোকটাকে বাঁচান যেতে পারে।

কাজ শুরু হল। অনুগত গৃহভৃত্য বলদেবকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে আসা হল। বিষেণ সিং বাইরের দরজায় পাহারায় রইল। তাকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হল সে যেন কাউকে ভেতরে ঢুকতে না দেয়। ঘুণাক্ষরে এসব খবর কাউকে যেন না জানায়। জরুরী কল এলেও যেন বলা হয় ডাক্তার ভাগলপুর গেছেন। পরের দিন ফিরবেন।

পূর্বাশা চপল ব্যানার্জীকে অপারেশনের সহায়তা করতে লাগলেন। বলদেবের শরীর থেকে রক্ত নেওয়া হবে স্থির হল। কারণ বলদেবের রক্তের গ্রুপিং ডাঃ ব্যানার্জী করে রেখেছিলেন। তার 'ও' গ্রুপের রক্ত থাকায় সে ইউনিভার্সাল ডোনার হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। অর্থাৎ তার রক্ত সকলকেই দেওয়া যেতে পারে।

পাশাপাশি টেবিলে দুজনকে শোয়ান হল। বলদেবের শরীর থেকে রক্ত

নিয়ে কেবল সিং-এর শিরায় বোতলে করে চালান দেওয়া হতে লাগল। দুজনের করোটি কাটা হল। প্রয়োজনীয় সব যন্ত্রপাতি চপলের কাছে ছিল।

যখন অপারেশন শেষ হল তখন ভোর চারটে। পুরো পাঁচ ঘণ্টা সময় লেগেছে। কেবল সিং-এর ব্লাড প্রেসারটা খালি ওঠা নামা করছে।

পূর্বাশা ভাবতে লাগলে হরিপদর ব্রেন এই পোড়া লোকটার টিস্যুগুলো সহ্য করবে তো?

চপলও সে কথা ভাবছিলেন। তিনি বললেন, না ও লোকটার এ্যান্টিবডিকে বাধাদেবার জন্য আমি ইনজেকসন দেব ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নিয়েছি।

কেবলের পোড়া অংশগুলোয় প্লাসটিক্ সার্জারি করে বদলে দেওয়া হল, ফলে তার চেহারাটা অন্যরকম হয়ে গেল।

হরিপদ তখন মারা গেছে। তার সমস্ত দেহ একটা কাঁচের জারের মধ্যে রেখে দেওয়া হল ফরমালিন দিয়ে।

ক্লান্তিতে দুজনের শরীর ভেঙ্গে আসছিল। ডাঃ ব্যানার্জী নিজের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করতে গেলেন। পূর্বাশা লাউঞ্জে একটা সোফায় গা এলিয়ে দিল। বিষেণ সিং আর বলদেব নিজেদের কামরায় চলে গেল। আর ঘণ্টা খানেক বাদে রক্তের বোতলটা লোকটার শিরা থেকে টেনে খুলে নিতে হবে। তা হলেই তাঁর ছুটি। নার্সিংহোমের অন্যান্য স্টাফ ও রোগীরা সমস্ত ব্যাপারটার কিছু জানতে পারল না। তারা অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

অপারেশন সফল হয়েছে। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল পূর্বাশা। মিনিট পঁয়ত্রিশ বাদে পূর্বাশা অপারেশন থিয়েটারে আবার এসে ঢুকল। সে দেখল রক্তের বোতলটা নিঃশেষিত প্রায়। ছুঁচটা টেনে খুলে দিয়ে জায়গাটায় একটা ছোট্ট প্লাস্টার লাগিয়ে দিল। রোগীর ব্লাড প্রেসারটা দেখল। পালস্‌টা দেখল, বেশ সুন্দরভাবে চলছে। চপলের নির্দেশ অনুযায়ী তাকে একটা অ্যান্টি-বায়োটিক ইনজেকসন্ দেওয়া হল। তারপর ফিরে গেল নিজের ঘরে এবং বিছানার ওপর এলিয়ে পড়ল। শরীর আর দাঁড়াচ্ছিল না। এখন তিন চার ঘণ্টা অন্ততঃ রোগী ঘুমাবে। কাজেই নিশ্চিন্ত।

সূর্যের আলো তখন বেশ ধারালো হয়েই পূর্বাশা নার্সিং হোমের ওপরে এসে পড়েছে। লনটার লম্বালম্বা ঘাসগুলো পুবের হাওয়ায় দুলছে। মরশুমী ফুলের ওপর কয়েকটা প্রজাপতি ফুরফুর করে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। গেটটা

পেরিয়েই লন। তার এক পাশে ডাক্তারের কোয়ার্টার। অন্যদিকে হাসপাতাল। তার পেছনে অপারেশন থিয়েটার। থিয়েটারের পেছনে আবার অনেকটা ফাঁকা জায়গা। এবড়ো খেবড়ো জমি। তারপরে উঁচু পাঁচিল।

—ধড়মড় করে উঠে বসলেন ডাঃ চপল ব্যানার্জী। চোখ রগড়ে ম্যান্টাল-পিসের ওপর রাখা টাইম পিসটায় দেখলেন আটটা বেজে গেছে।

আরে এতক্ষণ তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। স্লিপিং গাউনটা গায়ে চাপিয়ে চটি পরে তিনি লনটা পেরিয়ে অপারেশন থিয়েটারের দিকে ছুটলেন। হাসপাতালের পেছনে অপারেশন থিয়েটার। লাউঞ্জে ঢুকে দেখেন বিষেণ সিং অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তাকে না তুলে সোজা থিয়েটারে চপল ঢুকলেন,—আরে ?···সেই লোকটা গেল কোথায় ? কোথাও তার চিহ্ন মাত্র নেই। থিয়েটারের পাশে এ্যান্টিরুমে ঢুকে দেখলেন কাঁচের জারের ভেতর হরিপদর দেহটা একইভাবে পড়ে রয়েছে। সতর্কভাবে সেই দরজাটা ফের বন্ধ করে দেন। আঁতি পাঁতি করে চারদিক খুঁজলেন। কোথাও সেই অজ্ঞাত পরিচয় বিহারী যুবকটা নেই।

বাইরে ছুটে এসে বিষেণ সিংকে ডেকে তোলেন। বলদেব ও পূর্ব্বাশাও আসে। কিন্তু কেউ জানে না, লোকটা কোথায় গেল ?···আশ্চর্য ব্যাপার !

[ছয়]

রামপুর কলোনী। পাঁচিল দিয়ে ঘিরে কলোনীর বাসিন্দাদের রামপুর অঞ্চল থেকে আলাদা করে দিয়েছে। বিরাট একটা জায়গার চারদিক ঘিরে পাঁচিল। তার মাঝে মাঝে সারিবদ্ধভাবে রেলের কোয়ার্টার। প্রায় হাজার পাঁচেক লোক এই অঞ্চলের বাসিন্দা। তাদের শতকরা নব্বই জন বাঙালী। উত্তরদিকে একটা বিরাট গেট। গেট দিয়ে রামপুরে যাওয়া যায়। পূর্বদিকে ও দক্ষিণ দিকের গেট দিয়ে জামালপুরের বাজারেরও রেলওয়েরকারখানায় স্থানীয় লোকেরা যাতায়াত করে। কারখানায় যেতে গেলে জামালপুরের সদর বাজারের রাস্তা পেরোতে হয়।

সেদিন সকালে রামপুর কলোনীর রাস্তায় দাঁড়িয়ে আলোচনা চলছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের ভেতর। একটু চাপা উত্তেজনার আভাস।

—তাই তো, হরিপদ ছেলেটা গেল কোথায় ? ওর বুড়ো বাপ মা পাগলের মত খুঁজছেন ;. অনিল বোস বলে ওঠে। সে হরিপদর সহকর্মী।

—আচ্ছা, অফিসার করের বাড়িতে একবার খোঁজ নিলে হয় না। মিঃ গাঙ্গুলী বলেন।

—কিন্তু অফিসারের বাড়ি যাবে কে? আমার যাবার তো সাহস নেই। অনিল বলে।

—কিন্তু ওর বুড়ো বাপ মা তো পাগলের মত হয়ে গেছেন। তাদের জন্যেও প্রতিবেশী হিসাবে আমাদেরও তো কিছু করণীয় আছে। অসীম আইচ এগিয়ে এসে বলে।

অতঃপর স্থির হয় অসীম, অনিল এবং মিঃ গাঙ্গুলী এই তিনজনেই মিঃ করের বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেবেন—হরিপদ কাল রাত্রি থেকে নিখোঁজ, তাঁরা কিছু জানেন কি না?

তখন বেলা দশটা বাজে। কর সাহেব অফিস যাবার জন্য তৈরী হচ্ছেন। এমন সময় অনিলের দল সেখানে গিয়ে হাজির হয়ে সব খুলে বলল। কর সাহেব শুনে খুব অবাক হয়ে বললেন, তিনি তো এর বিন্দু বিসর্গ জানেন না। হরিপদ গতকাল রাত্রি নটার সময় রূপকের সঙ্গে বাড়িতে চলে গিয়েছিল। এষার সেদিন ছুটি থাকায় বাড়িতে ছিল। সে সব শুনে হতভম্ব হয়ে গেল। সে বলল, দাঁড়ান এখুনি আমি একবার মুঙ্গেরে রূপক বাবুকে ফোন করছি।

রূপক ফোনে খবর পেয়ে যেন আকাশ থেকে পড়ল! সে বলল, হরিপদকে সেদিন রেলওয়ে ব্রীজটা পেরিয়ে মুঙ্গের রোডের চৌমাথার মোড়ে সে পেঁছে দিয়েছিল। হরিপদ বলল সে একলাই সেখান থেকে বাড়ি যাবে। তার কথায় সে মুঙ্গেরে চলে এসেছে। রাত দশটার মধ্যেই পেঁছে গেছে। হরিপদর কথা এর বেশী আর সে জানে না। অগত্যা পুলিশে খবর দেওয়া হল।

* * *

ভোরের আলো তখন সবে ফুটেছে। হরিপদর ঘুম ভাঙ্গলো। সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। হরিপদ চিন্তা করে বুঝে উঠতে পারল না, সে এখন কোথায়? দেহে গভীর অবসাদ। আস্তে আস্তে তার মনে পড়তে লাগল গত রাত্তিরের কথা। রূপক রায়চৌধুরীর শয়তানী ঘটনাগুলো। সেই ভীষণ দর্শন মূর্ত্তিটা টানেলের ধারে পাহাড়ের তলদেশে তাকে ছুরি মেরেছিল। তারপর আর তার কিছু মনে নেই।

…কিন্তু সে এখন কোথায়? চারপাশে তাকিয়ে দেখল দেওয়ালের ভেতর-কার কাঁচের আলমারীতে একগাদা ছুরি, কাঁচি সাজানো। সে একটা শ্বেত

পাথরের টেবিলের ওপর শুয়ে আছে। মাথার ওপর ডোমে ঢাকা একটা বিরাট বাতিদান ঝুলছে। সেটা কিন্তু নেভানো। পূর্ব-দিকের কাঁচের জানলা দিয়ে ভোরের আলো উঁকি মারছে।···হঠাৎ তার মনে হল রূপকের শয়তানীর প্রতিশোধ নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়াল। তার মাথা ঘুরে গেল; কিন্তু সে টেবিলটা ধরে ভারসাম্য বজায় রাখল। পায়ে পায়ে বাইরে লাউঞ্জে বেরিয়ে এল। সেখানে দেখল বিষেণ সিং ঘুমোচ্ছে। ভাল করে তাকে লক্ষ্য করল না হরিপদ। তার মাথায় শুধু প্রতিশোধ স্পৃহা ঘুরছে। বাইরে লনের পাশেই ড্রাইভ ওয়েতে দাঁড়িয়ে সে গায়ে যেন প্রচুর শক্তি অনুভব করল। চারদিকে নিঃস্তব্ধ। সবাই ঘুমাচ্ছে। হরিপদ এতক্ষণে বুঝতে পারে সে ডাঃ ব্যানার্জীর নার্সিং হোমে আটকে পড়েছে— তা হলে ডাঃ ব্যানার্জী তাকে বাঁচিয়েছেন। বোধ হয় পাহাড়িয়া কেউ তাকে দেখতে পেয়ে এখানে পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু না···ডাঃ ব্যানার্জীকে ধন্যবাদ জানাবার জন্যে সে আর ফিরে যাবে না। তার একমাত্র লক্ষ্য এখন এষাকে সব জানান ও রূপককে শেষ করা।

সামনের নার্সিং হোমের উঁচু বাউণ্ডারীর ওয়ালটা দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় আটফুট উঁচু। দুহাতে তার ওপরটা ধরে হরিপদ টপকে ওপরে গিয়ে দাঁড়াল। হরিপদ একটু আশ্চর্য হয়ে গেল। তার গায়ে এত শক্তি এলো কোত্থেকে? নিজের হাত পা বেশবাসের দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। একটা বিহারী বাভনের পোষাক সে পরে রয়েছে। এত চওড়া কব্জি, এত চেটাল হাত তো তার কোনদিন ছিল না। হরিপদর অবাক লাগে। এক রাত্তিরেই যেন সব কিছু বদলে গেছে। সে কিন্তু এগিয়ে চলল পূব দিকের পাটম বস্তির দিকে। একটা নেড়ি কুত্তা তাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। হরিপদ সজোরে তার দিকে একটা ইঁট ছুঁড়ল। ঢিলটা গিয়ে লাগল তার গায়। কেঁউ কেঁউ করতে করতে কুকুরটা পালিয়ে গেল। হরিপদ আশ্চর্য হল। তার হাতে তো বেশ জোর এসেছে। কাছের একটা আম গাছের নীচুর ডালটা সে লাফিয়ে ধরবার চেষ্টা করল। আরে তাজ্জব ব্যাপার! এত উঁচু আম গাছটা সে ধরল কি করে? সে তো এত লম্বা ছিল না।

পাটম বস্তির ভেতরে ঢুকে হরিপদর কিন্তু ক্লান্তি আসতে লাগল। সে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল। ভোর বেলায় একটা গোয়ালিনী দুধ দিতে যাচ্ছিল। হরিপদকে দেখতে পেয়ে তার সাহায্যের জন্য ছুটে এল।

হরিপদর চেহারা দেখে গোয়ালিনী শিউরে উঠল। সারা শরীর কাটা ছেঁড়া সেলাইয়ের দাগ, মাথায় ব্যাণ্ডেজ। সঙ্গের দুধটা তাকে খেতে দিল। তারপর হরিপদকে নিজের বাড়ি নিয়ে গেল।

সে বাড়িতে বুড়ি গোয়ালিনীর সঙ্গে তার ছেলে থাকে। হরিপদর অবস্থা দেখে তারা তাকে সেখানে বিশ্রাম করতে বলল, তারপর হরিপদকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি হয়েছিল ? হরিপদ বলল একটা অ্যাক্সিডেণ্টে তার শরীরের এই অবস্থা হয়েছে। ডাক্তার ব্যানার্জীর নার্সিংহোম থেকে সে সেলাইগুলো করিয়ে এনেছে।

গয়লানীর ছেলেটা হবাক হয়ে তার মাকে বলল,—একে দেখে তো বাভন মনে হচ্ছে, কিন্তু এ হিন্দী বলছে বাঙ্গালীর মত। গোয়ালিনী গালে হাত দিয়ে বলল, বোধহয় বাঙ্গালী বাড়িতে কাজ করে। এখন চোট পেয়ে এরকম হয়ে গেছে। তা তুমি একটু ঘুমাও বাছা। এই খাটিয়ার ওপর শোও। এখানে আর দ্বিতীয় কেউ আসবে না। কোন দ্বিরুক্তি না করে গভীর ক্লান্তিতে হরিপদ সেই খাটিয়ার ওপর ঘুমিয়ে পড়ল।

যখন তার ঘুম ভাঙ্গল, তখন চারদিকে গোধূলির অন্ধকার নামছে। হরিপদর মাথার কাছে এক লোটা জল ছিল ও ভাঁড়ে দুধ ছিল। হরিপদ পুরো ভাঁড়ের দুধটা শেষ করল। তারপর মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিল। এমন সময় গোয়ালিনী ঘরে এসে দাঁড়ায়। তার ছেলে নাচান তখন গরু নিয়ে জামালপুরের মাঠে গেছে। ফেরবার অবশ্য সময় হয়ে এসেছে।

হরিপদকে উঠতে দেখে গোয়ালিনী একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তোমাকে তরতাজা দেখাচ্ছে। এতক্ষণ ঘুমাতে দেখে আমাদের খুব ভয় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তোমার ঘুমের ব্যাঘাত করিনি।

হরিপদ ততক্ষণে চাঙ্গা হয়ে উঠছে। সে বলল আমি এবার বাইরে যাব মায়ী।

—তোমার জন্য পুরী তরকারী রেখেছি। সেগুলো খেয়ে যাও বাবা।

গোয়ালিনীর দেওয়া খাবার খেয়ে হরিপদ বেরিয়ে এল। গোয়ালিনী তার পেছন পেছন এসে বলল, তুমি আমাদের কাছে আবার এস।

—আচ্ছা মায়ী, বলে তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে সে ছুটল।

সোজা সে উঠে গেল ফুটো পাহাড়ের সেই পাথরটার কাছে। তখনও চাপ চাপ রক্ত জমে আছে সেখানে। তারপর সে ছুটে চলল প্রিন্সেস স্ট্রীটের কর

সাহেবের বাংলোর দিকে।

এষা শোকাকুল মনে পিয়ানোর রিডটিপে গান করছিল—'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের পারে…।' বিড়ালের মত পায়ে সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে হরিপদ এসে পেঁছাল তার বেডরুমে।

ড্রেসিংটেবিল, তার পাশে আলমারী। তার পাশের দরজা দিয়ে সে ঢুকল। তাকে সে ভাবে সেখানে দেখে এষা গান বন্ধ করে একটা ভয়ার্ত্ত চিৎকার করে উঠল। আপ কোন হ্যায় ? হিঁয়া কাহে আয়া ?

—এষা ! আমি হরিপদ। আমায় তুমি চিনতে পারছ না…

এষা একজন মলিন বেশধারী বিহারীর মুখে পরিষ্কার বাংলা শুনে কেমন থতমত খেয়ে গেল।

এদিকে এষার আর্তনাদ শুনে বিনতা দেবী রান্না ঘর থেকে ছুটে এসে ঘরটার অন্যদিককার দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়ে বলেন—কি হল রে তোর ? অমন চেঁচিয়ে উঠলি কেন ?

হরিপদ হাত জোড় করে ফিস-ফিসিয়ে বলে—দোহাই আপনার, কাউকে বলবেন না আমি এখানে। আমি হরিপদ মাইতি। আপনার চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে আমাকে ভুলে গেছেন। বলেই সে আলমারীর পেছনে লুকোল।

বিনতা দেবী ঘরে ঢুকে, এষার ভ্যাবাচাকা খাওয়ার মুখভাব লক্ষ্য করেন ; কিন্তু ঘরে কাউকে দেখতে না পেয়ে, আশ্চর্যে বলে ওঠেন,—তোর কি হয়েছে ঠিক করে বলতো ? খুব ভয় পেয়েছিস মনে হচ্ছে। ততক্ষণে এষা নিজেকে সামলে বলে, না মা একটা যেন ছায়া দেখেছিলাম। ওই শাড়িটা ঝুলছে বোধ হয় ওটারই ছায়া।

—কি যে সব অলক্ষুণে ব্যাপার ঘটছে বুঝি না। সেই হরিপদ ছেলেটাই বা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে শুনলাম। কিন্তু তার হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। বলতে বলতে তিনি ঘরের বাইরে চলে যায়।

হরিপদ তখন আলমারীর পেছন থেকে বেরিয়ে এসে বলে—মিস কর আমি হরিপদ, মরিনি। আমাকে ডাঃ ব্যানার্জী বাঁচিয়েছেন। রূপক বাবু গুণ্ডা লাগিয়ে আমাকে খুন করতে গিয়েছিল।

—আরে আপ…আপনি হরিপদ কি করে হবেন ? আপনার চেহারা একজন বিহারী বাভনের মত। অথচ আপনি হরিপদ বাবুর মত কথা বলছেন।

—এঁ্যা…আমার চেহারা…হঠাৎ ড্রেসিংটেবিলের প্রমাণ সাইজ আয়নার

সামনে এসে দাঁড়াতেই হরিপদর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়।—একি! এ লোকটা কে? !···আমার চেহারা রাতারাতি কি করে বদলে গেল? মিস্ কর আপনি বিশ্বাস করুন আমি বুঝতে পারছি না এসব অঘটন কি করে সম্ভব হল? বলতে বলতে সে দুহাতে মুখ ঢেকে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে।

এষা অত্যন্ত উত্তেজিত ও ভীত হয়ে হরিপদর ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে এসে খপ্ করে তার হাতটা ধরে বলে আপনি আমায় ব্যাপারটা খুলে বলুন। রূপক রায় চৌধুরী আপনাকে কি ভাবে, কি পরিবেশে খুন করতে চেষ্টা করেছিল।

হরিপদ কাঁদতে কাঁদতে আনুপূর্বিক ঘটনাটা বিবৃত করে। তারপর এষার হাতদুটো নিজের মুঠোর মধ্যে ধরে বলে দোহাই আপনারা আমাকে বাঁচান। আমি কারুর কাছে মুখ দেখাতে পারব না।

এমন সময় বিনতা দেবী হঠাৎ ঘরে তাদের সে অবস্থায় দেখে ভয়ে চিৎকার করে ওঠেন চোর! চোর! মুহূর্তের মধ্যে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে হরিপদ জানলা টপকে বাইরে অন্ধকারে মিশে যায়।

এষা লোকটা কে? বিনতা দেবী প্রশ্ন করেন।

আমতা আমতা করে এষা বলে কি জানি বাইরে থেকে এসে আমার কাছে টাকা সাহায্য চাইছিল।

—নিশ্চয় চোর, গুণ্ডা কেউ হবে। তারপর তিনি হাঁক ডাক করে চাকর, মালি সকলকে ডাকতে থাকেন।

রাস্তায় নেমে হরিপদ পাগলের মত ছুটতে থাকে। সেই ফুটো পাহাড়ের দিকে। যেখান থেকে তার জীবনের রহস্যময় অধ্যায় শুরু হয়েছে।

সেই বড় পাথরটার গায়ে যেখানে তার ফিকে হয়ে যাওয়া রক্ত এখনও জমাট বেঁধে আছে, সেখানে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। সে আর কিছু ভাবতে পারছে না। ঘনঘন তার নিঃশ্বাস পড়তে থাকে, উত্তেজনা ও পরিশ্রমে।

···কেবল সিং· পাথরটার ওপাশ থেকে কে যেন বলে ওঠে।

চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে একটা সুন্দর সুশ্রী ছেলে পরনে শাড়ি। চকিতে তার পাহাড়ে পরীর কথা মনে পড়ে যায়। হরিপদ বোঝে তার চেহারা এখন কেবল সিং এর, হরিপদ নয় এবং এই ছেলেটি তাকে চেনে। উত্তেজনা দমন করে শ্রান্ত কণ্ঠে সে বলে কেয়া বাত? ছেলেটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—জান কাল উচিৎ সিং-এর এই ঘৃণ্য কাজের উপযুক্ত শাস্তি সে পেয়েছে। তোমরা লড়বার সময় যে আগুন জ্বলে উঠেছিল তাতে পুড়ে সে মারা গেছে। মুঙ্গেরের

অফিসার বাবুর কাছ থেকে যে নোট গুলো সে হরিপদকে খুন করবার জন্য নিয়েছিল সেগুলো কারুর ভোগে আসেনি। সব পুড়ে গেছে। অবোধরাম পালিয়ে গেছে। তুমি যে বাঙালী বাবুকে এখানে ছুরি মেরেছিল তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। বোধ হয় কেউ তাকে তুলে নিয়ে গেছে। পুলিশ তোমারও খোঁজ করছে। আমিও লুকিয়ে আছি কেবল সিং। চল এখান থেকে আমরা পালিয়ে যাই, জামালপুর মুঙ্গেরের বাইরে। যেখানে কেউ আমাদের চেনে না।

হরিপদর কাছে এবার সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। সে ছেলেটাকে বলে আমরা দুজনে দুদিক দিয়ে পালিয়ে যাই।

ছেলেটা আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে কিন্তু কেবল সিং তোমার জবান বাঙালীর মত হয়ে গেছে কেন? তোমার মুখটাও অন্য রকম অন্য রকম লাগছে।

হরিপদ তাকে পাশ কাটিয়ে অন্ধকারের বুকে মিলিয়ে যায়। হরিপদ ছুটতে ছুটতে পুর্বাশা নার্সিংহোমের পেছনকার পাঁচিল টপকে আবার সেই অপারেশন থিয়েটারে এসে পেঁছায় ঘরের কাঁচের জানলা খুলে।

—ঝুপ করে শব্দ হতেই ডাঃ চপল ব্যানার্জী চমকে ফিরে তাকান। তারপর হরিপদকে দেখে আশ্বস্ত হয়ে তিনি এগিয়ে গিয়ে বলেন আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে হরিপদ। তারপর বলে ডাক্তার আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন। আমার এই দেহটা এল কোত্থেকে? আমার দেহ মন দুই বিপরীত। একে অন্যকে সহ্য করতে পারছে না।

—বলব সবই খুলে বলব। আমার জীবনের সবচেয়ে সফল এক্সপেরিমেণ্ট আপনার মধ্যে রূপান্তরিত হয়েছে।

হরিপদ স্থির হয়ে একটা চেয়ারে বসে। আর ডাক্তার বলতে থাকেন গত রাত্তিরের ঘটনার কথাগুলো। তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে হরিপদর শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে।

—এবার আপনার ঘটনাগুলো আমাকে বলুন। কে আপনাকে হত্যা করতে গিয়েছিল? আর কেনই বা সে এ কাজ করল?

হরিপদ হু হু করে কাঁদতে থাকে; কিন্তু সে সবই খুলে বলে, কি ভাবে এবং কেন রূপক তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

এই সময় পুর্বাসা এসে ঘরে ঢুকে হরিপদকে সে অবস্থায় বসে থাকতে দেখে চমকে উঠে বলেন, সেই বিহারী লোকটি না?

হরিপদ একটা বিচিত্র হাসি হেসে চেঁচিয়ে বলে ওঠে— না না আমি বিহারী বাভন কেবল সিং নই আমি কেবল সিং-এর দেহে হরিপদ কেরানী। ডাঃ ব্যানার্জী আমার দেহটাকে বাঁচাতে পারেন নি, কিন্তু আমার সত্বাটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। এই অদ্ভুত দেহ মন নিয়ে আমি কি ভাবে সমাজে পরিচয় দেব ? কিভাবে বেঁচে থাকব ?

…বলুন…বলুন ডাক্তার সাহেব। আপনার কাছে হরিপদ আর কেবল সিং কেবল এক্সপেরিমেণ্ট এব গিনিপিগ ; কিন্তু আমাব জীবনটা যে নষ্ট হয়ে গেল। —আর বিধাতার কি বিচিত্র পরিহাস, যে কেবল সিং আমাকে হত্যা করতে গিয়েছিল তাব দেহটাকে আশ্রয় করেই আমি বেঁচে আছি।

—হঠাৎ হরিপদর মাথায় কি যেন একটা চিন্তা খেলে গেল। সে উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ আমার জীবনের সার্থকতা আছে এক জায়গায়। আর যতদিন না আমার সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হচ্ছে, ততদিন আমাকে বেঁচে থাকতেই হবে।

—কি ? কি আপনার অভিপ্রায় হরিপদ বাবু ? ডাক্তার আশ্চর্য হয়ে বলে ওঠেন।

…হাঃ…হাঃ…হাঃ করে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে হরিপদ। ফলেন পরিচয়তে। ক্রোধে তার মুখ তখন ভীষণ হয়ে উঠেছে।

হরিপদকে নিজের কোয়ার্টারের একটা আলাদা ঘরে শুইয়ে দিয়ে একটা ঘুমের ইনজেকেসন ডাক্তার দিয়ে দেন। আর বললেন সাতদিন আপনি এখন বাড়ি থেকে বেরোবেন না। অত্যন্ত দুরূহ অপারেশন করেছি আপনার ওপরে। আপনি যে আজ এ ভাবে চলে বেড়াতে পেয়েছেন, সেটাই আমাকে সবচেয়ে আশ্চর্য করেছে। সাতদিন বাদে আপনার স্টিচগুলো কেটে দিলে আপনি নিরাময় হয়ে উঠবেন। তারপর যে ভাবেই হোক আপনাকে সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠার ভার অমি নেব।

হরিপদ ঘুমিয়ে পড়লে, পূর্ব্বাশা আর চপল খেতে বসেন। খেতে খেতে পূর্ব্বাশাকে সমস্ত ঘটনাই চপল খুলে বলেন।

কিন্তু, এ ব্যাপারটা তো আইনের আওতায় আসবে। কেবল সিং একজন গুণ্ডা। তাকে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর হরিপদর বাড়ির লোকও নিশ্চয় তাকে খুঁজছে। তাদের কাছে তুমি কি জবাব দিহি দেবে। আর মিঃ রূপক রায় চৌধুরীর শয়তানীর কথা আমাদের পুলিশকে জানান উচিৎ। তার

শাস্তির দরকার। একদমে কথাগুলো বলে পুষ্পাশা চপলের মুখের দিকে উত্তেজনায় তাকিয়ে থাকে।

অন্যমনস্ক হয়ে ভাতটা মাখতে মাখতে চপল উত্তর দেন,—দেখ পুষ্পাশা, আমি যা করেছি তা ভবিষ্যতের সার্বিক মনুষ্য সমাজের উপকারের উদ্দেশ্যই করেছি। একথা সত্যি, আমার সফল এক্সপেরিমেন্টটা মুমূর্ষু হরিপদর জীবনে একটা দুঃস্বপ্ন এনে দিয়েছে। কিন্তু কোটি কোটি মানুষের উপকারের জন্য এরকম দু'-চারজনকে, সর্বকালেই বলি হতে হয়েছে। জান সার্জারির পথিকৃৎ ইংরেজ সার্জেনরা একসময় কবর থেকে বে আইনি ভাবে শবদেহ চুরি করে এনে, শবের ব্যবচ্ছেদ করে অ্যানাটমি শিখেছিলেন। বহু মূল্যবান রিসার্চ ও বর্তমানের ব্যবহৃত ভেষজ,এরকম বেআইনি এক্সপেরিমেন্টের পরোক্ষ আশীর্বাদ। —আর আইন? মানুষই আইন তৈরী করে, মানুষই আইন ভাঙ্গে।

[সাত]

জামালপুর পুলিশ স্টেশনে অনিল বোসের দল সমস্ত ঘটনাটা জানিয়ে ডাইরী করে ক্ষান্ত হল না। তারা পাহাড়ের চারদিকে নিজেদের লোক বসাল হরিপদর সন্ধানের জন্য। তারা বুঝতে পেরেছিল বহু কথিত পাহাড়ে পরীর সঙ্গে হরিপদর অন্তর্ধানের একটা সম্বন্ধ আছে।

জামালপুর পুলিশ স্টেশনের দারোগা বাবু কপিলদেও পাণ্ডের ওপর সমস্ত ব্যাপারটার তদারকীর ভার পড়ল। পাণ্ডেজী মুঙ্গের থেকে কুকুর নিয়ে এলেন। কুকুরকে হরিপদর ব্যবহৃত একটি জামা শুঁকিয়ে পাহাড়ের ধারে ছেড়ে দেওয়া হল। কুকুরটা ছুটে চলল ফুটো পাহাড়ের দিকে। ফুটো পাহাড়ের তলদেশে পৌঁছে কুকুরটা গর্জন করে উঠল। একটা জায়গার মাটি আঁচড়াতে লাগল।

পাণ্ডেজী ও তাঁর সহকর্মীদের সন্দেহ হল—মাটিটা রক্তাভ দেখে। পাণ্ডেজী একটা কাগজের মধ্যে মাটিটা খুঁড়ে তুলে নিলেন। পেছন থেকে পাণ্ডেজীর একজন সহকর্মী চেঁচিয়ে উঠল। পাশে খাদের মধ্যে একটা চকচকে জিনিষ দেখা যাচ্ছে। দড়ি বেঁধে এক জনকে নীচে নামিয়ে দেওয়া হল, সে নীচের থেকে ডাঃ ব্যানার্জীর পড়ে যাওয়া টর্চটা তুলে আনল।

—মাই গুডনেস, পকেট টর্চ! পাণ্ডেজী বলে উঠলেন।

জায়গাটায় অনেকগুলো পায়ের ছাপ ছিল ; কিন্তু বৃষ্টিতে সেগুলো ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেছিল। তার থেকে পাণ্ডেজী কোন সাহায্যই পেলেন না। কুকুরটা হঠাৎ ভীষণ গর্জন করে উঠল। তারপর লাফিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠে গেল।

সকালবেলার রোদের মিষ্টি আলোয় চারদিকের পাহাড় গাছপালা ধুইয়ে দিয়েছে। শেষ শরতের রোদটাও কড়া নয়। সবাই বুঝল কুকুরটা আরও কোন রহস্যের সমাধান করতে চলেছে।

কুকুরটার পেছন পেছন পাণ্ডেজী ও দু'-চারজন কনস্টেবল পাহাড়ের ওপর উঠল···আয়ে একি ?—সবিস্ময়ে পাণ্ডেজী বলে উঠলেন। সকলে দেখে পাহাড়টার একটা বড় পাথরের তলায় গুহামুখ ছোট ছোট গাছপালা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। কুকুরটা সেখানে গিয়ে চেঁচাতে লাগল। পাণ্ডেজী সেই খড়-ঘাস গাছের ঢাকনাটা টেনে খুলতেই গুহার মুখটা প্রশস্ততর হয়ে উঠল। তার ভেতর থেকে উজ্জ্বল সিংকে আবিষ্কার করে গ্রেপ্তার করা হল। তার পরিধেয় শাড়ি, পরচুলা ও ছোট ছোট বালবের মালা, রেলের যন্ত্রপাতি, কয়েকটি লাঠি ও অস্ত্রশস্ত্র পুলিশ সংগ্রহ করতে পারল।

উজ্জ্বল সিংকে জেরা করে পুলিশ পুরো ঘটনাটা জানল। হরিপদর হত্যা-কাণ্ড, কেবল সিং উচিৎ সিং-এর মারামারি, অগ্নিকাণ্ড, সবই পুলিশকে বিবৃত করল সেই ছেলেটা। অবোধ রাম ও কেবল সিং গা ঢাকা দিয়ে আছে সে কথাও সে বলল। সে খালি বলতে পারল না মুঙ্গেরের কোন অফিসার বাবুটি টাকা দিয়ে হরিপদকে খুন করার জন্য তাদেরকে প্ররোচিত করেছিল।

জয়ের আনন্দে মশগুল হয়ে পুলিশরা থানায় ফিরল। অবোধরামও ধরা পড়ল ; কিন্তু কেবল সিং কোথায় ? সারা শহর তোলপাড় করেও কেবল সিং আর হরিপদর খোঁজ পাওয়া গেল না। টর্চটা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারল সেটা ডাঃ চপল ব্যানার্জীর। কিন্তু চট করে পাণ্ডেজী পুষ্পাশা নার্সিং হোমে হানা দিতে রাজী হলেন না। তিনি চারদিকে জাল ফেলে, হাতে নাতে ধরবার ব্যবস্থা করলেন। পুষ্পাশা নার্সিং হোমের চারপাশে, পাহাড়ের কোণে কোণে পুলিশের লোক সাদা পোষাকে ছড়িয়ে রইল।

পাহাড়ে পরীর ও তার আলোক মালার রহস্য ; কি করে তারা ছদ্মবেশে পাহাড়চারীদের ধরে ছিনতাই ও গুণ্ডামী করত তার কথা কিন্তু গোপন রইল

না। সারা জামালপুরের শহরে সেটা ছড়িয়ে পড়ল। যদিও ডাঃ ব্যানার্জীর টর্চের কথা কেউ জানল না।

ফের একটা শনিবারের সন্ধ্যা রূপক রায় চৌধুরী তার গাড়িটা নিয়ে আবার এসেছে মিঃ সুবল করের বাড়িতে। অবশ্য এষা আগেই তাকে ফোনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

সাতদিন কেটে গেছে। হরিপদর অতর্কিত আগমন এষা ভুলতে পারছিল না। যদিও হরিপদর কাতরোক্তি, রহস্যময় গতিবিধি ও পরিস্থিতির কথা সে কাউকে জানায়নি।

সোফাদুটোর ওপরে মুখোমুখি বসেছিল রূপক এবং এষা। মাঝখানে একটা চৌকো সানমাইকার টেবিল। মিঃ রায় চৌধুরী, হরিপদ বাবুর কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ সেজন্য তোলপাড় করে খোঁজ চালাচ্ছে। একথা আপনি জানেন?

রূপকের মুখে একটা কাল ছায়া নেমে আসে। আর সে ভাবান্তরটুকু এষার নজর এড়ায় না।

একটা ঢোঁক গিলে রূপক বলে—সত্যি ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হচ্ছে। হরিপদ বাবুকে আমি মুঙ্গের রোডে ছেড়ে দিয়েছিলাম! তারপর কি হল কে জানে।

কিন্তু আপনি হরিপদ বাবুর সম্বন্ধে সত্যিই কি কিছুই জানেন না মিঃ রায় চৌধুরী। কথাগুলোর ওপরে একটু জোর দিয়ে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল এষা।

—না, না। কিন্তু আপনি আমাকে এত জেরা করছেন কেন? আচ্ছা আমি চলি। আমার আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। নমস্কার বলেই উত্তরের কোন অপেক্ষা না করেই রূপক ঝড়ের গতিতে বাইরে বেরিয়ে য

সাতদিন হয়ে গেল হরিপদর কোন খবর নেই। অনিল বোসের দল ঘাপটি মেরে পাহাড়ের ধারে বসে সে কথাই ভাবছিল। পুলিশ যদিও রহস্যের সমাধানে অনেকটা এগিয়েছে; কিন্তু হরিপদর খোঁজ তো পেল না। তারা অস্থির হয়ে সেকথা নিজেদের মনে আলোচনা করছিল।

'পূর্ব্বাশা নার্সিংহোমে' হরিপদকে মরফিন ও অন্যান্য সম্মোহন ইনজেকসন দিয়ে এতদিন চপল তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছেন, যাতে সে জানতে না পারে।

সেদিন সকালে হরিপদর স্টিচ কাটা হবার পর তাকে আর কোন ইনজেকসন দিলেন না ডাঃ চপল ব্যানার্জী। ক্ষতস্থান গুলো পরিষ্কার হয়ে গেছে। প্লাস্টিক সার্জারির অংশাবশেষগুলো দেহের ও মুখের চামড়ার সঙ্গে ঠিক ভাবে মিলে গেছে। এখন হরিপদ শারীরিক দিক দিয়ে বিপদ মুক্ত। এত দিন সম্মোহক ইনজেকসন দিয়ে রাখার ফলে তার মস্তিষ্কের উত্তেজনা নিশ্চয় অনেকটা প্রশমিত হয়েছে; এই ভেবে তার ওপর আর কোন নজর রাখেন নি ডাঃ ব্যানার্জী।

হরিপদর ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন বেলা পাঁচটা। ধড়মড় করে সে বিছানায় উঠে বসল। দূরের দেবদারু গাছের ফাঁক দিয়ে, কাঁচের সার্সি ভেদ করে অস্তসূর্যের ঝিলমিলি তার চোখে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার পেছনকার কথাগুলো সিনেমার ছবির মত পরপর মনে পড়তে লাগল। 'আর তার সারা দেহ-মন জুড়ে প্রতিহিংসার চাপা স্ফুলিঙ্গটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের প্রতিশোধ।

রূপক রায়চৌধুরী? অন্ততঃ তোমাকে শেষ শিক্ষা দেবার জন্য আমাকে বেঁচে থাকতে হয়েছে। লাফ দিয়ে ঘরের বাইরে এল সে। আগেকার অভ্যেস মত নার্সিংহোমের বাউণ্ডারী ওয়াল হাতে ভর দিয়ে টপকে পার হল সে। ডাঃ ব্যানার্জী তার পরিধেয় বস্ত্র বদলিয়ে দিয়েছেন। ছুটতে লাগল পাহাড়ের টানেলটার দিকে। পাটমের বর্সাতিটার পাশ দিয়ে যাবার সময় পুলিশের একটা লোক তাকে দেখে ভাবল কেবল সিং না। কিন্তু কাছে এসে ভাল করে নজর করে বুঝল না এ অন্য কোন নওজোয়ান গোয়ালা হবে।

আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে প্লাসটিক সার্জারির ফলে কেবল সিংএর মুখের আদলটা বদলে গেছে। আর তার পোষাক গুলো ডাঃ ব্যানার্জী এর মধ্যে পাল্টে দেওয়ায় তাকে চেনার অসুবিধা আছে।

ফুটো পাহাড়ের তলার রেললাইনের কাছে এসে রূপকের মাথায় আবার একটা চিন্তা এল। অপরাধীর সহজাত মানসিক তাড়না থেকে সে আবার পূর্বেকার ঘটনা স্থলটা পরিক্রমা করতে গেল।

···ছুটতে ছুটতে হরিপদ রেললাইনের কালভার্ট-এর তলায় এসে সামনে একটা দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়াল। সজনে গাছের তলায় রূপকের কালো গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। দাঁত কিড়মিড় করে হরিপদ গাড়িটায় সজোরে একটা লাথি মারল। ক্যাঁচ···ক্যাঁচ করে গাড়িটা আর্তনাদ করে উঠল। হরিপদর মাথায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। তিন লাফে কালভার্টটার ওপরকার রেল-

লাইনের ওপর উঠে দাঁড়াল। তার জামার বাঁপাশের পকেটে ধারাল ছুরিটা সে মুঠো করে চেপে ধরল! ডাঃ ব্যানার্জীর কোয়ার্টার থেকে ছুরিটা সে হাতিয়েছিল।

...এইবার...এইবার শয়তান রূপক রায় চৌধুরী, তার হাতের মুঠোয় এসেছে। রেললাইন ধরে তিন মিনিট দৌড়াতেই ফুটো পাহাড়ের তলদেশে এসে পেঁাছোল।

কালো পাথরটায়,—যার গায়ে হরিপদ কেবল সিং এর ছুরিকাঘাতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল সেখানটায় রূপক হাত বোলাচ্ছিল আর বিড়বিড় করে কি যেন বলছিল।

আচম্বিতে পেছন থেকে সিংহের গর্জনের মত—রায় চৌধুরী সাব্। ধ্বনি শুনে ভীষণ চমকে রূপক পেছন ফিরে তাকাল। কাস্তে চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় সে দেখতে পেল কেবল সিং দাঁড়িয়ে অট্টহাস্য হাসছে।

—আরে! কেবল ?...তুমি কোথায় এতদিন লুকিয়ে ছিলে ? পুলিশ তোমার খোঁজ করছে তা জান ? সাবধানে থেক। সেই হরিপদ কেরাণীর লাশটা গেল কোথায় ?

—হরিপদ কেরাণীর লাশ...হাঃ...হাঃ...হাঃ আমি কেবল সিং নই মিঃ রায় চৌধুরী। আমি সেই হরিপদ কেরাণী। ঘৃণ্যভাবে আপনি আমাকে বন্ধুর ছদ্মবেশে এইখানে টেনে নিয়ে হত্যা করিয়েছেন। আমার দেহটা মরে গেছে; কিন্তু আমি মরিনি।

রূপক যেন কিরকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। সত্যিই তো এতো কেবল সিংএর মুখচোখ নয়। হরিপদ তো নয়ই। কিন্তু লোকটা এরকম পরিষ্কার বাংলা বলছে কি করে? আর হরিপদর কথাই বা জানল কি করে; হরিপদর হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই রূপক একটা মানসিক অস্থিরতায় ভুগছিল। প্রথমে সে ভেবেছিল হরিপদ তার রাস্তা থেকে সরে গেলেই এষা সহজ লভ্যা হয়ে উঠবে: কিন্তু হরিপদর অন্তর্ধানের পরে এষা তাকে গ্রহণ তো করলই না উপরন্তু মনে হল সে যেন রূপকের ওপর বীতশ্রদ্ধ। আর তাছাড়া এষা আজ তাকে যেন কি রকম সন্দেহের চোখে দেখে, কাটা কাটা কথা বলছিল।

ভয়, বিস্ময় ও অপরাধীর হতাশা মিশ্রিত মনোবৃত্তি নিয়ে রূপক আগন্তুককে প্রশ্ন করে আপনি যেই হন, আপনি কি চান আমার কাছ থেকে? এখানে এভাবে আমার পেছন পেছন এসেছেন কেন?

…হা…হা…হাঃ করে ফের অট্টহাস্য করে উঠল…সেই সবল দীর্ঘদেহী মূর্তিটা। তারপর ইস্পাত কঠিন কণ্ঠে বলতে লাগল, মিঃ রূপক রায়চৌধুরী, আপনি একজন বড় অফিসার। আর আমি হরিপদ কেরাণী। সামান্য বেতনে কাজ করি। তাহলেও একথা সত্যি, এষা আপনাকে কোনদিনই ভালবাসেনি। আপনার মত শয়তানকে তার মত মেয়ে কখনও ভালবাসতে পারে না। ঈর্ষায়, হিংসায় আপনি আমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আপনার সে উদ্দেশ্য আংশিক সফল হয়েছে বটে, কিন্তু পৃথিবী থেকে আপনাকেও সরে যেতে হবে।

রূপক এতক্ষণে মনে মনে ভাবছিল সে যেন কোন একটা ক্রাইম ড্রামার সংলাপ শুনছে। হরিপদ থামতেই সে কিন্তু অবস্থার গুরুত্বটা উপলব্ধি করে বলে—আমার আশ্চর্য লাগছে এই ভেবে যে, আপনার কথাগুলো হরিপদবাবুর মতই লাগছে; কিন্তু আপনার চেহারাটা এরকম হল কি করে?

একটা বিচিত্র হাসি খেলে গেল দীর্ঘদেহী, শাল প্রাংশু মূর্তিটার মুখে। তারপর হরিপদ সংক্ষেপে তার কাহিনী বিবৃত করল।

শিউরে উঠল রূপক। এও কি সম্ভব? পকেটের ভেতর থেকে ছুরিটা বার করে বজ্রমুঠিতে ধরে হিংস্র কণ্ঠে হরিপদ বলে উঠল…প্রতিশোধ নেবার জন্যেই আমি এখনও বেঁচে আছি। ছোরাটা রূপকের দেহে বসাবার আগেই রূপক ঘুঁসি মারল মূর্তিটার হাতে। ঝনঝন করে ছোরাটা পাথরটার ওর পড়ে গেল। তারপর দুজনের ধস্তাধস্তি শুরু হল। রূপক বড়লোকের ছেলে হলেও যথেষ্ট বলশালী ছিল। ব্যায়ামের চর্চাও করেছিল। কিন্তু দুর্দান্ত কেবল সিং-এর আসুরিক শক্তির কাছে সে পারছিল না।

হরিপদ তাকে ধরাশায়ী করে যখন বুকের ওপর চেপে বসল তখন তার ডান হাতটা সেই ছুরিটার ওপর গিয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে ছুরিটা ধরে সে হরিপদর দেহে বসিয়ে দিল। তীব্র আর্তনাদ করল হরিপদ; কিন্তু ছাড়ল না। এক ঝটকায় ছুরিটা ছাড়িয়ে নিয়ে রূপকের গলায় আমূল বসিয়ে দিল। স্থির হয়ে গেল রূপকের দেহ। তারপর বিকট হাস্যে চারদিক খান খান করে হরিপদ উঠে দাঁড়াল।

ছুরিটা তার পাঁজরার ওপর লেগেছিল। সে দিকবিদিক ভ্রুক্ষেপ না করে ছুটে চলল, নার্সিং হোমের দিকে।

হাসির শব্দে আর রূপকের মরণার্তনাদের আওয়াজে, সচকিত হয়ে ছুটে

এল অনিল বোসের দল। তারা দেখতে পেল ছুরি হাতে কেবল সিংকে। তারা রূপকের দিকেই মনোযোগ দিল। ওদিকে সাদা পোষাকের পুলিশের দল, পাণ্ডেজীও ছুটে এলেন ঘটনাস্থলের দিকে। পুলিশের একটা লোক কালভার্টের খাড়াই বেয়ে রেললাইনের ওপরে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু হরিপদ সেই ষোল ফুট উঁচু কালভার্টের ওপর থেকে তাকে ডিঙিয়েই নীচের ধূসরিত রাস্তায় লাফিয়ে পড়ল।

রূপকের পার্ক করা গাড়িটার দিকে তাকিয়ে জিঘাংসায় ভীষণ হয়ে উঠল তার চোখ। গাড়িটার টায়ারে সজোরে ছুরি বসিয়ে দিল সে। ছুরির শুদ্ধু টায়ারটা পাংচার হয়ে চুপসে গেল।

···ধর···ধর···ধর শব্দে পাণ্ডেজীর দল তাকে তাড়া করল। কিন্তু তীরের বেগে হরিপদ তাদের অনেক পেছনে ফেলে ছুটে চলল।

'পূর্ব্বাশা নার্সিং হোম' আসতেই তার পেছনকার পাঁচিলটা হরিপদ টপকে ভেতরে লাফাল।

অপারেশন থিয়েটারে বসেছিলেন ডঃ চপল ব্যানার্জী ও পূর্ব্বাশা। হরিপদর অন্তর্ধানের কথা তাঁরা আলোচনা করছিলেন। এমন সময় বিষেণ সিংকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে, লাউঞ্জ পেরিয়ে হরিপদ এসে সে ঘরে ঢুকল।

রূপককে হত্যা করার পর থেকেই হরিপদর মাথায় রূপকের একটা উক্তি খালি ঘুরপাক খাচ্ছিল— হরিপদর লাশটা গেল কোথায়?···

রক্তাক্ত কলেবর হরিপদকে ঢুকতে দেখে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল পূর্ব্বাশা। ডাক্তার বিচলিত হলেও শান্ত কণ্ঠে হরিপদকে বললেন, টুলটার ওপর বসুন হরিপদ-বাবু। আপনি একটা কাণ্ড বাধিয়ে এসেছেন দেখছি? কি হয়েছে বলুন।

হরিপদর বুকের বাঁ পাশ দিয়ে রক্ত তখনও ঝরছিল। সেখানটায় একটা মুঠো গজ চেপে ধরে স্টিকিং প্লাসটার লাগিয়ে দেন ডাক্তার।

—ডাক্তারবাবু। ···হরিপদ মাইতির লাশটা গেল কোথায়? তীব্র আর্তনাদ করে উঠল কেবলরূপী হরিপদ।

ডাঃ ব্যানার্জী এ প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু বুঝলেন, উত্তর তাঁকে দিতেই হবে। কেঁপে উঠে তিনি পাশের এ্যাণ্টি রুমের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

দরজাটা আধ ভেজান ছিল। বাইরে থেকে দেখলে সেটাকে দরজা বলে মনে হবার সম্ভাবনা নেই।

এক ঝটকায় দরজাটা খুলে ফেলে হরিপদ ভেতরে ঢুকে কান ফাটান হাহাকার করে উঠল।

—আর ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার ভেতর দিয়ে অপারেশন থিয়েটারে এসে ঢুকলেন—পাণ্ডেজী ও তাঁর সহকারীরা। তাদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আলাদা-ভাবে সেখানে এসে ঢুকল অনিল বোসের দল। তাদের সঙ্গে এষা ও মিঃ কর।

স্থানুর মত ডাঃ ব্যানার্জী ও পূর্বাশা দাঁড়িয়ে রইলেন। হরিপদর তীব্র বিলাপে চারদিক বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। সে ঘরে ঢুকে উপস্থিত আগন্তুকেরা সভয়ে দেখলেন, কাঁচের জারে শায়িত রয়েছে হরিপদর মৃতদেহ। তার কাটা খুলির উপরিভাগ থেকে মস্তিষ্কটা সম্পূর্ণভাবে তুলে নেওয়া হয়েছে।

—ডাঃ ব্যানার্জী আপনি আণ্ডার অ্যারেস্ট। বলেই পাণ্ডেজী, হরিপদকে ধরতে যাচ্ছিলেন : কিন্তু হরিপদ সেই লম্বা কাঁচের জারের ওপর আছড়ে পড়ল।

ধরাধরি করে হরিপদকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে আসা হল ; কিন্তু তাকে আর বাঁচান গেল না।

ডাঃ চপল ব্যানার্জী পুলিশের কাছে সমস্ত ঘটনাই খুলে বলেন। কিছুই লুকালেন না। পরিশেষে শুধু তিনি বললেন, পৃথিবীর অনেক সাফল্যের মূলেই আছে এ ধরনের ছোটখাট আত্মাহুতি। আমি দুটো মুমূর্ষু মানুষকে বাঁচাবার জন্যেই একের মস্তিষ্ক অন্যের দেহে সংযোজন করেছিলাম ; তাতে আমি সফলও হয়েছিলাম ; কিন্তু প্রকৃতির পরিহাসে ব্যাপারটা অন্যভাবে দাঁড়াল।

*   *   *

বিচারে ডাঃ চপল ব্যানার্জী কিন্তু বেকসুর খালাস হয়ে যান।

নারীমেধ

॥ এক ॥

ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছিল। রাস্তায় বেশ জল দাঁড়িয়ে গেছে। বিকেল তখন পাঁচটা, কিন্তু আকাশ ঘিরে মেঘ জমে থাকায় চারদিকের আলো নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

লেক প্লেসের দোতলা বাড়ির ফ্ল্যাটে বসে চিরন্তন আর অসীম ঝালমুড়ি চিবোতে চিবোতে কফি পান করছিল, আর সেদিনকার খবরের কাগজে বেরোন এক লোমহর্ষক নারী হত্যাকান্ড নিয়ে আলোচনা করছিল।

চিরন্তন সাইকোলজিতে এম. এস. সি পাশ করে সখের ডিটেকটিভগিরি করে। এখনও অকৃতদার। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। সম্প্রতি কয়েকটা কেসে সাফল্য অর্জন করে সে বেশ সুনাম ও অর্থোপার্জন করেছে।

অসীম এখন কলকাতার এক বেসরকারী কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত আছে।

খুনের খবরটা পড়ে তোমার কি মনে হল চিরন্তন? অসীম জিজ্ঞেস করে।

এ সম্বন্ধে আমরা কোনো মন্তব্য করতে পারি না অসীম। কারণ খুনটা হয়েছে প্রায় শেষরাত্রে এবং সেজন্য খবরের কাগজে একটা ছোট্ট খবর বেরিয়েছে। পুরো রিপোর্ট আমরা এখন পাইনি, উত্তর দেয় চিরন্তন।

করর্…করর্…তীব্র শব্দে কলিং বেল বেজে ওঠে।

বীরেন দেখ তো এই ঝড়-বাদলায় কে এল?

চিরন্তনের কথায় তার খাস চাকর কাম-বাটলার বীরেন জানা দরজা খুলতে চলে যায়।

যেই অসুক না কেন, তার প্রয়োজন যে জরুরী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অসীম একটু থেমে বলে।

বীরেনের সঙ্গে রেনকোট পরে হ্যাট মাথায় এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন।

—আরে সুব্রত যে? বস, বস, কি খবর?

ম্লান হেসে সুব্রত রেনকোট আর হ্যাটটা নামিয়ে বীরেনের হাতে দেয়।

বীরেন আর এক কাপ কফি বাবুর জন্য কর। চিরন্তন হুকুম দেয়।

আগন্তুক সুব্রত সোম কলকাতার ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একজন পদস্থ অফিসার। আই-এ-সি-তে সে আর চিরন্তন একই সঙ্গে আশুতোষ কলেজে পড়ত। তারপর এম-এস-সি পড়ে আই. পি. এস পাশ করে সুব্রত হোম ডিপার্টমেণ্টে যোগদান করে।

ব্যাপারটা গুরুতর। আজকের কাগজে তোমরা যে খুনের খবরটা পড়েছ, তারই কথা বলছি। সুব্রত বলে।

অসীম একটু নড়েচড়ে বসে বলল, হ্যাঁ, সেটার কথাই আমরা এখন আলোচনা করছিলাম।

ওহ্...হো...তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। ইনি আমার বন্ধু সুব্রত সোম, আই. বি. ডিপার্টমেণ্টের বড় অফিসার। কলেজে একসঙ্গে পড়তাম। আর ইনি অসীম মুখার্জী, আমার স্কুলের সহপাঠী। কলকাতার এক কলেজে অধ্যাপনা করেন ও অবসর সময়ে আমার কাজের সঙ্গী।

এই সময় বীরেন ট্রেতে করে তিন কাপ কফি নিয়ে এসে ঢোকে।

ধূমায়িত কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে সুব্রত বলে, দ্যাখ চিরন্তন, কলকাতার একেবারে শেষপ্রান্তে যেখানে জলা জমি ভরাট করে নতুন হাউসিং এস্টেট গড়ে উঠেছে সেখানেই এই কাহিনীর সূত্রপাত। আজ ভোর রাত্রে ওই হাউসিং এস্টেটের কাছাকাছি এক কারখানার একজন কর্মী হাউসিং এস্টেটে ফিরছিল। সেখানে সে তার দাদার ফ্ল্যাটে থাকে।

হাউসিং এস্টেটটা একটা উপবৃত্তাকার খাল দিয়ে ওই কারখানার দূরত্ব বজায় রেখেছে। খালটার এককোণে এল. আই. জি. অর্থাৎ লো ইনকাম গ্রুপের ফ্ল্যাট বাড়ী। খালটার অপর কোণে এম. আই. জি. অর্থাৎ মিডিল ইনকাম গ্রুপের বাসিন্দাদের বাড়ীগুলো অবস্থিত। প্রত্যেকটি বাড়িই চারতলা। এবং প্রত্যেক তলাতে দুটো করে ফ্লাট।

এল. আই. জি. কোয়ার্টারগুলোয় যেতে গেলে গেট দিয়ে ঢুকে একটা আইল্যাণ্ডের মধ্যে দিয়ে ছোট্ট একটা সেতু পেরিয়ে যেতে হয়।

আইল্যাণ্ডটা বেশ সুন্দরভাবে সাজান। দুপাশে বসার বেঞ্চ। ছেলেদের খেলবার জন্য সি-স, দোলন সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে। আইল্যাণ্ডের ভেতরটায় ফিক্সড্ স্ট্যাণ্ড-ল্যাম্প রয়েছে। প্রায়ই অবশ্য সেগুলো জ্বলে না।

ঘটনার দিন ভোর চারটের সময় সেই কর্মী অর্থাৎ হরেন সরখেল, নাইট

ডিউটি সেরে সেই আইল্যাণ্ডের মাঝামাঝি এসে দেখতে পায় বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে এক ভদ্রমহিলা বসে রয়েছেন। তার সন্দেহ হওয়ায় সে কাছে গিয়ে ভদ্রমহিলাকে ডাকতে থাকে; কিন্তু কোন সাড়া না পাওয়ায় সে ভয় পেয়ে যায়। তার চেঁচামেচি শুনে আশপাশ ফ্ল্যাটগুলো থেকে আরও কয়েকজন ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা আসেন। সেখানকার বাসিন্দা ডাঃ বরুণ চক্রবর্তী তাকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

কেসটা আমার হাতে আসায় আমি সেখানে যাই। অবশ্য আমি সেই হাউসিং এস্টেটে নিয়মিতই যাতায়াত করতাম। আমার বন্ধু গভর্ণমেণ্টের জুডিসিয়াল ডিপার্টমেণ্টের মি· রায় সেখানেই থাকেন।

পুলিশকে ঘটনাটা জানানো হলে আমি ঘটনাস্থলে যাই। সেখানে গিয়ে দেখতে পাই ভদ্রমহিলা বেঞ্চে বসে আছেন। তার কোন অলংকারাদি, হাতঘড়ি নিজস্ব জিনিষপত্র কিছুই খোয়া যায়নি। ভদ্রমহিলার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। গলার চারদিকে সরু ফাঁসের দাগ কালচে হয়ে বসে গেছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে যাই এই ভেবে যে, এই ভদ্রমহিলার সঙ্গেই আমার কিছুদিন আগে মিঃ রায়ের ফ্ল্যাটে আলাপ হয়েছিল। তিনি এই হাউসিং এস্টেটেরই বাসিন্দা। নাম ধ্রুবা দাস! স্কুলের শিক্ষিকা। তিনি যে কি কারণে ঐ সময়ে বেঞ্চে বসতে গিয়েছিলেন আমি এর কোনই কূল কিনারা করতে পারছি না।

[দুই]

হাউসিং এস্টেটে চিরন্তন, অসীম ও সুব্রত যখন এসে পেঁছাল তখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। বৃষ্টি একেবারে থেমে গেছে; কিন্তু নিচু জমি বলে সমস্ত জায়গাটা জলে ডুবে রয়েছে। আইল্যাণ্ডের ভেতরে এসে দাঁড়াল তারা। আইল্যাণ্ডটা মোচাকৃতির। তার চারদিকে তার দিয়ে ঘেরা থাকায় কারুর জলে পড়ে যাবার ভয় নেই। চারিদিকের স্ট্যাণ্ড ল্যাম্পগুলো আজ রাত্তিরে ঠিকই জ্বলছে। বেঞ্চিটা ও তার চারপাশের জায়গাটা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করল চিরন্তন। মাটিতে জল জমে থাকার জন্য কারুর পায়ের ছাপ পাওয়া অসম্ভব।

অসীমের দিকে ফিরে চিরন্তন বলল, তুমি এখানে থাকলে তোমার কাব্যের খোরাক খুঁজে পেতে অসীম।

কিন্তু আমাদের তো এখন কাব্য করার সময় নেই। খুনটার একটা কিনারা

করতেই হবে।...

পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট আমরা পেয়েছি, এতক্ষণে সুব্রত মুখ খোলে। রিপোর্ট অনুযায়ী ধ্রুবা দাসকে সরু রেশম জাতীয় ফিতে দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। মৃতা বাধা দেবার কোন চেষ্টাই করেনি। ধস্তাধস্তির কোন লক্ষণ নেই। মনে হয় আততায়ী মৃতার কোন বন্ধু বা বান্ধবী ছিল।

ডাঃ বরুণ চক্রবর্তীর জবানবন্দীতে জানা গিয়েছে যে তিনি এম. আই. জি-তে থাকেন। ভোর চারটের সময় গণ্ডগোল শুনে সেখানে আসেন, এবং দেখেন ধ্রুবা দাস বেঞ্চির ওপর হেলান দিয়ে পড়ে আছেন। তিনি যে মৃতা দেখলে বোঝার উপায় নেই। তার নাড়ী পরীক্ষা করে ও হৃৎপিণ্ডের স্তব্ধতা দেখে ডাঃ চক্রবর্তী তাকে মৃতা বলে ঘোষণা করেন। তার শরীরে অস্বাভাবিক কিছুই তিনি লক্ষ্য করেননি। শুধু মৃতার মুখে একটা বিস্ময়ের ভাব পরিস্ফুট ছিল। আর তার কাপড় থেকে একটা দামী সেণ্টের, খুব সম্ভবত ইভনিং ইন প্যারিসের গন্ধ ভেসে আসছিল।

তাঁর মতে অন্তত আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা আগে তার মৃত্যু হয়েছিল। কারণ তিনি যখন পরীক্ষা করেন তখনও রাইগার মর্টিসের কোন লক্ষণ মৃতার শরীরে ছিল না। পোস্ট মর্টেমের রিপোর্টেও রাত একটা থেকে দেড়টার সময় ধ্রুবা দাসের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।

চিরন্তন সুব্রতর বন্ধু এবং সেখানকার বাসিন্দা জুডিসিয়াল ডিপার্টমেণ্টের মিঃ রায়কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাদি করেন। মিঃ রায় তার জবানীতে বলেন, ধ্রুবা দাস তার বাড়ির পেছনে থাকতেন। তিনি খুব সোস্যাল টাইপের মেয়ে ছিলেন। দশজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। মিঃ রায়ের ফ্ল্যাটে আয়োজিত এক পার্টিতে ধ্রুবা দাসের সঙ্গে তিনি সুব্রতর আলাপও করিয়ে দেন। ধ্রুবা দাস শুধু সুন্দরী নয় সুকণ্ঠীও ছিলেন।

মৃতা দাস এম. আই. জিতে দু-কামরা একটা ফ্ল্যাটে তার মা ও ছোট ভাইয়ের সঙ্গে থাকতেন। সংসারটা তার রোজগারে চলত। তার মা ও ভাইকে জিজ্ঞাসাদি করেও চিরন্তন বিশেষ অগ্রসর হতে পারেন নি। মা নেহাতই গোবেচারা ভালমানুষ। ধ্রুবার ভাই প্রদীপ বি. এ. ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। সে বলেছে, ঘটনার দিন রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পরে তার দিদি অন্য একটা ফ্ল্যাটে মিসেস ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে যান। তার পরে তিনি আর ফিরে আসেন নি। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। তার কারণ তার দিদি মাঝে

মাঝে এরকম বেরিয়ে যেতেন ও অনেক রাত্রে ফ্ল্যাটে তার ঘরে ফিরে আসতেন। তারা দরজা ভেজিয়ে রেখে শুয়ে পড়ত। দিদি বাইরে থেকে তালা দিয়ে চলে যেত এবং রাত্তিরে তালা খুলে আবার নিজের ঘরে শুয়ে পড়ত। তারা সবসময় জানতেও পারত না।

রাত্তিরে হাউসিং এস্টেটে যে পাহারা দেয় তাকে প্রশ্নাদি করে যা জানা গেছে তা হল এই যে, রাত্তিরে সে বেশ তোফা ঘুম দিয়েই পাহারা দেয়।

ঘটনাস্থল ঘুরে সুব্রত সোমের ছোট্ট স্ট্যান্ডার্ড টেন গাড়িতে করে ফেরবার সময় চিরন্তন প্রশ্ন করল তুমি মিস্ ধ্রুবা দাসকে কতটুকু জানতে?

সুব্রত বলল, মিস্ দাসের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল মিঃ রায়ের বাড়ির এক পার্টিতে। মিস্ দাস কেবল যে সুন্দরী ও সুকণ্ঠী ছিলেন তা-ই নয়, তিনি রসালাপেতে বেশ অভ্যস্ত ছিলেন। লোকের সঙ্গে চট করে মিশতেও পারতো। তারপর থেকে ধ্রুবা দাসের সঙ্গে আমার বারকয়েক দেখা হয়েছে। তবে তার বাড়ীতে কোনও দিন আমি যাইনি এবং ঘনিষ্ঠতাও ছিল না।

ট্রাফিক লাইট আসতে, গাড়ীর স্পীডটা একটু কমিয়ে দিল সুব্রত, তারপর মুখ ঘুরিয়ে বলে, তুমি এর ভেতর থেকে কিছু বার করতে পারলে চিরন্তন?

উঁ...হু। সমস্ত জিনিসটা হাওয়ায় ভাসছে। আনমনা হয়ে চিরন্তন বলে, তবে একটা জিনিস বুঝতে পারছি- মৃতাকে যে হত্যা করেছে, সেও ভদ্রসমাজের লোক এবং মৃতার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতাও ছিল। কিন্তু সে যে কেন হত্যা করল অর্থাৎ হত্যার মোটিভটা স্পষ্ট নয়। ধ্রুবা দাসের কিছুই খোয়া যায় নি। খুব ঠাণ্ডা মাথায়ই তাকে খুন করা হয়েছে। তাছাড়া ধ্রুবা দাস সোসাইটি গার্ল ছিলেন। কারুর সঙ্গেই তার অসদ্ভাব ছিল না। এবং কারুর সঙ্গে সে যে প্রেমে পড়ছে এমন কোনও প্রমাণও আমরা পাইনি।

খুনী কি হাউসিং এস্টেটের লোক না বাইরের? অসীম জিজ্ঞাসা করে।

খুনী ভেতরের কিংবা বাইরেরও হতে পারেন। এ বিষয়ে সঠিক কিছু বলা যাচ্ছে না। চিরন্তন উত্তর দিল।

সে রাত্তিরে অসীমকে তার রিচি রোডের বাড়ীতে এবং চিরন্তনকে লেকপ্লেসে পৌঁছে দিয়ে সুব্রত সোম তার টালিগঞ্জের বাড়ীতে চলে গেল।

[তিন]

দশদিন পরের কথা রিচি রোডে অসীমের নিজের বাড়িতে বসে অসীম আর চিরন্তন আড্ডা মারছিল। রোববার সকালবেলা। সামনে ম্যাডাক্স স্কোয়ার থেকে ফুরফুরে হাওয়া ভেসে আসছে।

সেদিনের সকালবেলার কাগজটা নিয়েই তাদের আলোচনা চলছিল। সেই হাউসিং এস্টেটের রহস্যজনক নারীহত্যার কোন কিনারা করে উঠতে পারেনি খবরের কাগজে ক'দিন ধরে সেই হত্যা কাহিনীর রসালো খবরগুলো বেশ ফলাও করে ছাপা হচ্ছে। পুলিশের অকর্মণ্যতার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে প্রতি লাইনে লাইনে।

—আচ্ছা চিরন্তন, তোমার কি মনে হয় ধ্রুবা দাসকে কোন গুণ্ডা খুন করেছে?

—না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ কাজ কোন উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে এবং সেইজন্যই সমস্যা সমাধান করতে এত দেরী হচ্ছে। এবং আমার বিশ্বাস নিকট ভবিষ্যতে এ ধরনের নারীহত্যার আবার চেষ্টা হবে।

কিন্তু কেন?

এই কেন-র উত্তরটা আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না।

গোঁ-ঘস্-স্ শব্দে ব্রেক কসে একটা গাড়ি দরজার সামনে থেমে গেল।

সুব্রত আমাকে খুঁজতে এখানেই ধাওয়া করেছে দেখছি।

কি করে বুঝলে সুব্রত এসেছে?

ওটা সুব্রতর স্ট্যান্ডার্ড টেনের শব্দ। চিরন্তন হাসতে হাসতে উত্তর দেয়।

দরজায় নক্ করতেই অসীম গিয়ে দরজাটা খোলে।

সুব্রত ঘরে ঢুকে বলে, চিরন্তন, তোমার বাড়ি গিয়ে শুনি তুমি এখানে। তাই সরাসরি অসীমবাবুর বাড়িতে চলে এসেছি।

সুব্রতর দিকে তাকিয়ে অসীম বলে, সুব্রতবাবু, আমার সমবয়সী এবং চিরন্তনের মারফতে একে অন্যের বন্ধু, সেজন্য আপনাকে অনুরোধ আমাকে নাম ধরেই ডাকুন আর আপনি সম্বোধন ছাড়ুন।

সুব্রত হাসতে হাসতে উত্তর দেয়, হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন। পৃথিবীটা গোল। আমাদের পরস্পরের দেখা হবে এটা বোধহয় বিধাতার অভিপ্রেত ছিল।

কিন্তু আমাদের পৃথিবীটা এখন ত্রিভুজ হয়ে গেছে। চিরন্তন রহস্য করে বলে, আর সেই ত্রিভুজের তিনটে কোণে আমরা বসে আছি। আর কিছুতেই মাঝখানে পেঁছাতে পারছি না।

চিরন্তন তোমরা রসিকতা করছ, কিন্তু আমার যে জান রাখা দায় হয়ে উঠল। খুনটার কোন কিনারাই আমরা করতে পারলাম না, সুব্রত অস্থির হয়ে বলে। তারপর একটু অপেক্ষা করে ফের গম্ভীর হয়ে বলে, তোমরা হোটেল ঈগলের নাম শুনেছ ?

কেন, সেখানে কি হয়েছে ? অসীম সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে।

কিছু হয় নি। তবে হোটেল ঈগলে একটা স্পেশাল পার্টির আয়োজন করেছেন সেখানকার কর্তৃপক্ষ। তাতে আমিও নিমন্ত্রিত আছি।

এতে আর বিশেষত্বের কি আছে ? অসীম নীরস সুরে বলে।

হ্যাঁ, এর বৈশিষ্ট্য আছে। এতে নিমন্ত্রিত অতিথি অভ্যাগতের সংখ্যা খুবই সীমাবদ্ধ এবং তারা প্রত্যেকেই সমাজের নামী দামী লোক। আরও একটা মজা হচ্ছে যে, সমস্ত জিনিষটাই খুব গোপন রাখা হয়েছে, এমন কি, শুধু যে নিমন্ত্রিত অতিথিরা পরস্পরকে চেনেন না তা নয়, নিমন্ত্রণকারী হোটেলের কর্তৃপক্ষও সকলকে জানেন না।

কিন্তু তাতে বৈশিষ্ট্যের কি আছে ?

শহরে এখন ইটালী থেকে বেঁনেমাঁতির ক্যাবারে পার্টি এসেছে। তাদেরই উদ্যোগে সেখানে নাচ গান বাজনা হৈ হুল্লোরের ফোয়ারা বইবে।

কিন্তু সে তো অনেক খরচের ব্যাপার। অসীম প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, সে খরচের সমস্তটাই বহন করছেন হোটেলের নিমন্ত্রিত রুই কাতলারা।

তোমার আসল উদ্দেশ্যটা কি এবার ভনিতা রেখে তাই বল। চিরন্তন সিরিয়াস গলায় বলে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়ার রিং ছাড়িয়ে সুব্রত বলে, সেই গোপন পার্টিতে যাবার কার্ড আমি পেয়েছি, এবং আমি চাই তোমরা দুজনও আমার সঙ্গে যাও।

কিন্তু এটা তো গ্র্যাটিস পার্টি নয়। তুমি যাবার পাশ পেতে পার কিন্তু আমরা কি ভাবে যাব ?

দ্যাখ, চিরন্তন, আমার বন্ধু ইনকাম ট্যাক্স অফিসার মিঃ বস ঐ হোটেলের

অ্যাসেসার। তাকে বলে আমি তিনটে গেস্ট কার্ড বার করেছি। আমাদের চারজনের খরচ হোটেল কর্তৃপক্ষই দেবেন। কারণ তারা মিঃ বলকে হাতে রাখতে চান।

তোমার আসল উদ্দেশ্য কিন্তু এখনও খুলে বলছ না, সুব্রত। আমরা কি শুধু সেই রূপসী নর্তকীদের চটুল লাস্য, কলহাস্য উপভোগ করতেই যাব সেখানে?

না চিরন্তন, আমার উদ্দেশ্য আরও গভীরে। নিভন্ত সিগারেটটা অ্যাস্ট্রের ভেতর গুঁজে দিয়ে সুব্রত দাঁড়িয়ে উঠে বলে, ইনফরমারের মারফত জেনেছি, কুখ্যাত কালোবাজারী হীরা সিং ওই গোপনীয় পার্টিতে উপস্থিত থাকবে।

তাকেও ট্রেস করতে চাই। সে অনেক পাপের ভাগীদার।

বেশ আমরা দুজনেই যাব। কি বল অসীম?

অসীম সায় দিয়ে বলে, বেশ, আমার কোন আপত্তি নেই।

আচ্ছা, আজ তাহলে আসি। তাহলে ঐ কথাই ঠিক রইল। আগামী শনিবার রাত নটায় হোটেল ঈগলের লাউঞ্জে আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব। বলেই ঝড়ের গতিতে সুব্রত বেরিয়ে যায়।

সেদিকে তাকিয়ে থেকে চিরন্তন বলে, দেখ অসীম, আমাদের তিনজনেরই এক জায়গায় কিন্তু মিল রয়েছে। আমাদের তিনজনেরই বয়স প্রায় এক এবং তিনজনই অকৃতদার।

অসীম চিরন্তনের এই আচমকা কথার মানে বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে থাকিয়ে থাকে।

[চার]

হোটেল ঈগল, শনিবারের রাত। কথামত সুব্রত রাত নটার সময় লাউঞ্জে অপেক্ষা করছিল। চিরন্তন আর অসীম ট্যাক্সি করে ঠিক নটার সময় হোটেল ঈগলের গেটের সামনে এসে দাঁড়াল।

দু'দিকে দুটো গেট, তার উপর সুদৃশ্য ডোমে ঢাকা বাতিদান—হলুদ আলো বিকিরণ করে চলেছে। গেট দিয়ে ঢুকতেই একটা চওড়া পোর্টিকো। তার তলায় সারি সারি গাড়ি পার্ক করা আছে।

পোর্টিকোর পরেই একটা চওড়া সিঁড়ি ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গেছে। সেখানে মেন গেট। কাঁচের দরজা দুটোর হ্যাণ্ডেল ধরে লাল উর্দিধারী উষ্ণিষ পরা বিরাটাকায় দুটো দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে। চিরন্তন আর অসীমকে দেখে একজন কুর্ণিশ করে, আইয়ে সাব—বলে দড়জাটা খুলে ধরে।

ভেতরে ঢুকতেই এয়ার কণ্ডিসানের স্নিগ্ধ প্রলেপ তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলল। সারা শরীরের অবসাদ যেন জুড়িয়ে গেল।

সেটা একটা বিরাট হলঘর। তার একদিকে লাউঞ্জ আর একদিকে রিসেপসানের কাউণ্টার। মাঝখান দিয়ে কার্পেটে মোড়া চওড়া প্যাসেজ, সে দুটো জায়গাকে এক সুনির্দিষ্ট গণ্ডি দিয়ে বিভক্ত করে রেখেছে।

লাউঞ্জটার ভেতরে মোটা মোটা দুটো থাম। থামের গায়ে সুদৃশ্য বেলজিয়াম কাঁচের কারুকার্য, আর ঠিক মাঝখানে দুটো প্রমাণ সাইজ আয়না। থাম দুটোর পেছনে চওড়া লাউঞ্জে ইতস্ততঃ কয়েকটা সোফাসেট ছড়ানো। তলায় পুরু কার্পেট। সেই লাউঞ্জে থামের আড়ালে একটা সোফা দখল করে বসে সুব্রত সিগারেটের ধোঁয়ার রিং সৃষ্টি করছিল।

সুব্রতকে দেখে কিন্তু আজ বাইরের লোক চিনতে পারবে না। তার মাথায় কাঁচা পাকা চুল, মুখের ওপর পুরুষ্ট-গোঁফ. পরণে দামী নেভি ব্লু কালারের স্যুট। চশমার সরু ফ্রেম পাল্টে কালো মোটা ফ্রেমের চশমা পরে সে এসেছে। চিবুকে মানানসই ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। তাকে দেখলে মনে হয় সদ্য বিলাত ফেরত কোন মাঝবয়সী মুসলমান ডিপ্লোম্যাট।

অবশ্য চিরন্তন আর অসীমকেও চিনবার উপায় নেই! চিরন্তনের পরনে লংকোট, মাথায় খয়েরী রঙের গান্ধী টুপি, পরেন কাল রঙের চুড়িদার পাজামা। দেখলে মনে হয় দিল্লী কি উত্তরপ্রদেশীয় কোন এক ব্যবসায়ী। অসীমকে অবশ্য ব্ল্যাক সার্জের স্যুট পরে বাঙালী ভদ্রলোকের মতই দেখাচ্ছে।

অসীম আর চিরন্তনকে দেখে থামটার আড়াল থেকে উঠে এসে গুড্ ইভনিং বলে তাদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে বলল মনে রেখ আমি মি. ইব্রাহিম। চিরন্তন মিঃ সাকসেনা দিল্লীর ব্যবসায়ী। আর অসীম মিঃ বাসু, কলকাতার বড় মার্চেণ্ট অফিসের একজন এক্‌সিকিউটিভ। আরও মনে রেখ হীরা সিংকে আমাদের নজরে রাখতে হবে। তাকে আমি এই হোটেলে ঢুকতে দেখেছি। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সে গা ঢাকা দিয়ে আছে।

সুব্রতর সঙ্গে চওড়া প্যাসেজ দিয়ে সোজা গিয়ে তারা লিফটে উঠল।

পাঁচতলার হোটেলটার একেবারে উপরতলায়, এই বিশেষ গোপনীয় অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ছোট্ট একটা হল ঘর। কাঠের মেঝের মাঝখানটায় দামী কার্পেট বিছানো। এক কোণে ছোট্ট প্ল্যাটফর্মের ওপরে জাজব্যাণ্ড নিয়ে অর্কেস্ট্রা পার্টি বসে আছে। মাঝখানকার চৌকো কার্পেটার কোণে কোণে ইতস্তত বসানো রয়েছে কতকগুলো টেবিল। আর সেই টেবিলে গোটা কয়েক চেয়ার।

হলঘরটায় লাল নীল কাগজের চেন ঝুলছে। তাদের সঙ্গে একগাদা রং-বেরঙের বেলুন ঝোলানো। সমস্ত হলঘরটা ভরে আলো আঁধারির খেলা। দেওয়ালের ভেতরে বসানো বিভিন্ন আধারের বাতিদানগুলো থেকে ঈষৎ রঙিন আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আলোগুলোর রং আবার থেকে থেকে পাল্টে যাচ্ছে।

ইনকাম্ ট্যাক্স অফিসার মিঃ বল সেই হলঘরে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিল হোটেলের ম্যানেজার— মি পিটার গোমেজ। জাতে গোয়ানিজ। রঙে ইউরেসিয়ান। সুব্রতদের দেখে মিঃ বল এগিয়ে এসে তাদের ভেতরে আসতে আমন্ত্রণ জানালেন।

মিঃ বলকে সুব্রত আগেই বলে দিয়েছিল তারা একজন দাগী আসামী, সে নাকি সমাজের একজন রাঘব বোয়াল গোছের লোক, তাকে নজর করার জন্য এখানে এসেছে। মিঃ বল কথা দিয়েছিলেন, এ সম্বন্ধে তিনি বাইরেই কিছু বলবেন না। মিঃ বল সুব্রতদের রিসিভ করতেই, মিঃ গোমেজ গুড ইভনিং··· হাউ ডু ইউ ডু জেন্টলমেন বলে সাদর অভ্যর্থনা করে তাদের জন্য নির্দিষ্ট স্পেশাল গেস্টদের টেবিলের সামনে বসিয়ে দিল।

টেবিলটা ঘিরে চারজন বসল। টেবিলের সামনে একটা থাম থাকায় সুব্রতর স্থান হল সকলের পিছনে। সুব্রত এমনভাবেই বসেছিল যাতে সে ঘরের সবাইকে লক্ষ্য করতে পারে; কিন্তু কাছ থেকে ভালভাবে নজর না করলে তার মুখ কেউই দেখতে পারে না।

আশেপাশের টেবিলগুলোয় এক এক করে বিশিষ্ট অতিথিরা তখন এসে বসতে শুরু করেছেন। সকলের জন্য আসন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিরীটি সেটা কিছুক্ষণ বাদে বুঝতে পারল।

স্পেশাল গেস্টদের টেবিলটা প্ল্যাটফর্মের একেবারে কাছেই ছিল। একটা ভায়োলিনের মধুর মূর্চ্ছনা প্লাটফর্ম থেকে ভেসে আসছিল।

বিশালদর্শন এক শিখ ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। তার সঙ্গে এলেন একজন

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রমহিলা। মিঃ বল ফিস্‌ফিস্‌ করে তাদের বললেন, ইনি হচ্ছেন দি ব্যাংো কোম্পানির ডাইরেক্টর মিঃ বলবন্ত সিং।

তার একটু পরেই এক এক করে সব সিটই ভরে গেল। শুধু একটা টেবিলে দুইখানা চেয়ার খালি রয়ে গেল।

মিঃ বল রসিক লোক। টাক মাথা, থলথলে মোটা সোটা নাদুস নুদুস চেহারা। তার অঙ্গুলীহেলনে উদীপরা বয় এসে হাজির হল। মিঃ বলের নির্দেশে রঙীন পানীয় পরিবেশিত হল সকলের গ্লাসে।

অসীমের ইতস্ততঃ ভাব দেখে চিরন্তন মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলল, মনে রেখ, তুমি অসীম মুখার্জী নও এখন, পদস্থ অফিসার মিঃ বাসু। আর আমরা এসেছি সমাজের এক শত্রুকে নজর করতে। তুমি কোন কিছু খেতেই আপত্তি কর না।

হঠাৎ চাপা স্বরে বলে উঠল স্বব্রত, হীরা সিং আসছে।

ঘরের ভেতর তখন আলো আরও নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। সুন্দর সুশ্রী নাতিদীর্ঘ চেহারার গোঁফ-দাড়ি কামানো কালো রংয়ের ইংলিজ সার্জের স্যুট পরে এক ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। তার বাহুলগ্না হয়ে স্বল্পবাস এক শুভ্রকেশী নীল নয়না বিদেশিনী।

তারা এসে ঘরের মধ্যেকার বাকি দুটো খালি চেয়ার দখল করে বসল। সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজার পিটার গোমেজের নির্দেশে জাজব্যাণ্ড বেজে উঠল।

···লেডিজ প্লিজ।······জেণ্টলমেন প্লিজ। গুরুগম্ভীর স্বরে মিঃ গোমেজ বলে উঠলেন, দিস্‌ ইজ্‌ আওয়ার গালা পারফরমেন্স ইন দিস্‌ ওয়ারম্‌ নাইট। আপনাদের প্রথমে একটা সোলো গেয়ে শোনাচ্ছেন স্ক্যাণ্ডনেভিয়ান নাইটিং গেল মিস্‌ ক্যারু।

ব্লণ্ড হেয়ারের একজন যুবতী এসে গান শুরু করল। তার সঙ্গে তাল দিয়ে অর্কেস্ট্রা পার্টির বাজনা শুরু হল।

সমস্ত টেবিলের গ্লাসগুলো তখন রক্তাভ পানীয়তে ভরে গেছে। ঘরে আস্তে আস্তে নামছে একটা মদির ঘুমঘোর। তারা যেন ক্রমশ একটা অন্য কোন রাজ্যে হারিয়ে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে কখন যে তাদের ডিনার সার্ভ হতে শুরু করেছে অসীম বুঝতে পারেনি। চারকোর্সের ইংলিশ ডিনার টেবিলে টেবিলে সার্ভ হতে লাগল।

চিরন্তন হলঘরটার চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। সমস্ত ঘরটার

মধ্যে বোধ হয় কেবল তারা চারজন ছাড়া বাঙালী আর কেউ নেই। সবশুদ্ধ গোটা তিরিশ নরনারী জমায়েত হয়েছে সেখানে। এরা যে সমাজের ধনাঢ্য, অভিজাত শ্রেণীর সে বিষয়ে চিরন্তনের কোন সন্দেহ ছিল না। টেবিলে উপবিষ্ট নরনারীদের মধ্যে বোধহয় একমাত্র হীরা সিংয়ের সঙ্গিনীই খাঁটি বিদেশী। শাড়ি পরে, রুক্ষ চুল শ্যাম্পু করে, অন্যান্য যে কজন ভারতীয় মহিলা বসে ছিলেন তারা যে সবাই পশ্চিমী ধাঁচের খানাপিনা ও নাচগানে অভ্যস্তা, সেটা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

মিস ক্যারুর গান শেষ হতেই মিঃ গোমেজ ঘোষণা করলেন, এবার মঁসিয়ে রেনেমাত্তির পার্টির মিস্ উলফ তার গালা ড্যান্স শুরু করবেন।

ঘোষণাটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্পেশাল গেস্টদের টেবিলের পাশ থেকে অন্ধকারের বুক চিরে ছুটে মাঝখানের কার্পেটের ওপর এসে দাঁড়াল সর্বাঙ্গ নেকড়ের চামড়ায় ঢাকা এক শ্বেতাঙ্গিনী বিদেশিনী।

নাচ শুরু হল। মেয়েটির কালো কালো চুলগুলো শরীরের এপাশ থেকে ওপাশে আছাড়ি পিছাড়ি খেতে লাগল। এরপর নাচের তালে তালে মেয়েটির দেহ নেকড়ের চামড়ার খোলস খুলে পড়ে, হ্রস্ববাসা, পীনোন্নতা এক ব্যালেরিনার সুগঠিতা দেহ আত্মপ্রকাশ করল। তন্ময় হয়ে হলের সকলে সেই নেকড়ে মেয়ের নাচ দেখতে লাগল। তার উন্মুক্ত বক্ষ, জঙ্ঘা, পেলব বাহু, গুরুভার নিতম্ব থেকে যৌবন যেন পিছলে পিছলে পড়ছে। চোখে তার কামনার আমন্ত্রণ।

নেকড়ে নাচ শেষ হতে মিঃ গোমেজ বললেন— লেডিজ অ্যাণ্ড জেণ্টলমেন— এবার ইণ্টারভ্যালের পরেই আমাদের বেষ্ট পারফরমেন্স অনুষ্ঠিত হবে।

ডিনার তখন শেষ হয়ে গেছে। ঘরের আলোগুলো আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণের বিরতি। তারপর মিঃ পিটার গোমেজ মাঝখানে দাঁড়িয়ে আবার ঘোষণা করলেন, এবার আমরা আজকের রাত্তিরের সেরা আইটেম আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি।

সুদূর গ্রীক দেশ থেকে আপনাদের সামনে এসে পৌঁছাচ্ছেন মোস্ট এক্সাইটিং বেলুনগার্ল,—মিস্ লার্ভোস্তু। তিনি আপনাদের আজকের রাত্তিরের মোস্ট এক্সোটিক ড্যান্স দেখিয়ে পরিতৃপ্ত করবেন।

ঘরের মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন খেলে গেল।

আবার কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধতা নামল। হীরা সিংকে আবার দেখা তার বিদেশিনী সঙ্গীনীর সঙ্গে বাহুলগ্না হয়ে সামনের ফ্লোরে নাচতে। আরও দু-এক জোড়া নর-নারী ইতস্তুতঃ এগিয়ে এল। তারপর অভ্যস্ত পদক্ষেপে তারাও বলড্যান্স শুরু করল।

চিরন্তন একদৃষ্টিতে হীরা সিংকে লক্ষ্য করছিল। নাচতে নাচতে হীরা সিং যখন তাদের টেবিলের কাছে এল, তখন তার মুখভাবের হঠাৎ পরিবর্তন চিরন্তনের সতর্ক নজর এড়াল না, সে বুঝতে পারল হীরা সিং তাদের সন্দেহ করেছে।

নাচ থামিয়ে যে যার আসনে বসে পড়তেই প্রত্যেকের হাতে একটা করে আলপিন দেওয়া হল। আলপিন দেবার সময় মিঃ পিটার বলে গেলেন, বেলুনগার্ল আপনাদের কাছে এলে আপনারা আলপিন দিয়ে তার দেহের একটা করে বেলুন ফাটাবেন।

দপ্ করে হঠাৎ ঘরের আলো নিভে গেল। চারিদিকে সূচিভেদ্য অন্ধকার। ঘরের কোন এক কোণ থেকে এক নারী কণ্ঠের ভীত আর্তনাদ শোনা গেল।

লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন প্লিজ বেলুনগার্ল এখুনি আপনাদের সামনে উপস্থিত হবেন।

প্ল্যাটফর্মের ওপর থেকে একটা ইংরাজী পপ্ সঙ্-এর বাজনা বেজে উঠল… আই লাভ ইউ, ইয়ে…ইয়ে…ইয়ে—

আবার ঘরের মাঝখানে একটা নীল আলো জ্বলে উঠল। সেই আলোয় চারিদিক দ্যুতিময় হয়ে উঠল। সবাই দেখতে পেল সেখানে সহাস্যে দাঁড়িয়ে আছে সোনালি চুলের এক সুন্দরী শ্বেতাঙ্গিনী। যেমন সুন্দর তার গায়ের রং তেমনি টানা টানা তার নাক চোখ চিবুক। মনে হল যেন সৌন্দর্যের রাণী ভেনাস হোটেল ঈগলে এসে দাঁড়িয়েছে।

মহিলাটির সারা দেহ হাত পা কোমর কাঁধ পিঠ বুক পেট জুড়ে অজস্র বেলুন বাঁধা রয়েছে। এমন কি, তার চুলগুলো পর্যন্ত বেলুনে ঢাকা। শুধু সুন্দর সুডোল মুখটি খোলা।

নাচ শুরু হল। এঁকে বেঁকে সাপের মতো চক্রাকারে মেয়েটি নাচতে লাগল। প্লাটফর্মের ওপর থেকে জাজ্‌ব্যাণ্ডে বাজনাটা আরও জোরদার হয়ে উঠল। সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত নাচটা দেখতে লাগল।

এরপরে মেয়েটি এক একটা কলি গেয়ে নাচতে নাচতে চকিতা হরিণীর মত

বিভিন্ন টেবিলের কিনারার পুরুষদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে দাঁড়াতে লাগল। আর সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হাসি হেসে তারা এক একটা বেলুনে পিন ফুটিয়ে দিতে লাগল। ফটফট করে বেলুনগুলো ফাটতে লাগল। আর সেই সঙ্গে বেলুনগার্লের নগ্নগাত্রের শুভ্রতা বেরিয়ে পড়তে লাগল।

মেয়েটি হীরা সিং-এর কাছে যেতেই সে প্রচণ্ড উল্লাসে পিন ফুটিয়ে আর একটা বেলুন ফাটাল। মদির হাসি হেসে বেলুনগার্ল তার গায়ের আরও কাছে ঘন হয়ে দাঁড়াল। কামোন্মত্ত হয়ে হীরা সিং তাকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরতে চাইল। কিন্তু বেলুনগার্ল যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল, সে সাপের মত সতর্কতায় পিছলে বেরিয়ে এল হীরা সিং-এর হাতের ভেতর থেকে। কণ্ঠে তার তখন চটুল গানের একটা কলি, নো···নো ক্লোজার···আর মোর ক্লোজ প্লিস।

মেয়েটির শরীরের অনেকটা তখন অনাবৃত হয়ে গেছে। শুধু বুক আর কোমর বাকী। আর সব বেলুনগুলোই ফেটে গেছে।

হিস···হিস করে উঠে সুব্রত, এটা অন্যায়, এটা বেআইনী। এ ধরনের নাচ কি ভাবে পুলিশের অনুমতি না নিয়েই অনুষ্ঠিত হচ্ছে? পুলিশ কখনই এ ধরনের স্ট্রিপটিজ ড্যান্সের অনুমতি দিতে পারে না এ দেশে।

মিঃ বল চাপা স্বরে বললেন, হোটেলের মালিক কর্তার সিং বেধহয় এ নাচের বিন্দুবিসর্গও জানে না। হোটেলের ম্যানেজারই টাকা খেয়ে এ নাচের ব্যবস্থা করেছে।

নাচের তালে তালে মেয়েটির সারা শরীর হিল্লোলিত হয়ে উঠল। তারপর শেষ বেলুনটি ফাটার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ নিরাবরণ এক সুন্দরী তরুণীর দেহ আত্মপ্রকাশ করল। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মাঝখানের কার্পেটের ওপর, নাচের ভঙ্গিতে হাত পা প্রসারিত করে। দপ করে আলোটা আবার নিভে গেল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তারপরে বিদ্যুৎস্ফুরণের মধ্যেই একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল। সেই আলোয় দেখা গেল মেয়েটি আর হলঘরে নেই।

সুব্রতকে যেন কি রকম অস্থির দেখাতে লাগল। এক সময় সে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি বাথরুম থেকে ঘুরে আসছি। বলেই সে বেরিয়ে গেল।

আবার বলড্যান্স শুরু হল। চিরন্তন লক্ষ্য করল হীরা সিং আর তার

সঙ্গিনীর আসন দুটোও খালি। চারিদিকে তখন এক শ্লথ মদিরতার আবেশ নেমে এসেছে। তীব্র পানীয়ের প্রভাবে সকলেরই ঢুলু ঢুলু ভাব।

অসীমও যেন কি রকম নার্ভাস বোধ করছিল। সে সময় চিরন্তন বলল- চল, এবার আমরা চলে যাই।

মিঃ বল শান্তভাবে হেসে, বললেন পার্টি শেষ না হলে উঠে যাওয়া খুবই বেমানান ও অভদ্রতা হবে।

অসীম কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল, রাত এগারটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট।

মিঃ পিটার গোমেজ আবার প্ল্যাটফর্মের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন- লেডিজ এ্যান্ড জেন্টেলমেন, এখন শুরু হবে আমাদের দি গ্রেট ম্যাজিক অফ ইন্ডিয়া। ম্যাজিক দেখাবেন মিঃ প্রাণ ও মিস্ পরী। বলে তিনি চলে গেলেন।

এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক ও অল্পবয়সী এক পাঞ্জাবী ভদ্রমহিলা স্টেজের সামনে এসে দাঁড়াল।

লেডিজ এ্যান্ড জেন্টেলমেন, মিঃ প্রাণ বলে উঠলেন, আমি মিস্ পরীকে হিপনোটাইজ করে দ্বিখণ্ডিত করে আবার তাকে পুনরুজ্জীবিত করব। বলেই তিনি হাততালি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার দুজন সহকারী এসে দুটো স্ট্যান্ড দুপাশে রাখল। তার ওপর একটা কাঠের তক্তা বিছান হল।

মিস্ পরীকে সম্মোহিত করতে লাগলেন, মিঃ প্রাণ। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। অনায়াসে তাকে দুহাতে তুলে কাঠের তক্তার ওপর শুইয়ে দিলেন মিঃ প্রাণ। একটা ইলেকট্রিকের করাত নিয়ে এল সহকারী দুজন। করাতের সাহায্যে মিনিট কয়েকের মধ্যে দু টুকরো করা হল মেয়েটির দেহ। কোমর থেকে নীচের অংশটুকু দুহাতে তুলে ধরলেন ম্যাজিসিয়ান মিঃ প্রাণ, বললেন, আপনারা দেখুন এই খণ্ডিত দেহ থেকে রক্ত ঝরছে।

শিউরে উঠল অসীমের দেহ। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন কেউ কেউ।

হেসে উঠলেন মিঃ প্রাণ, বললেন লেডিস্ এ্যান্ড জেন্টলমেন আপনারা নার্ভাস হবেন না, এখনই আমি অংশ দুটো জোড়া দিয়ে দিচ্ছি।

তার সহকারী দুজন কাটা অংশ দুটো আবার ঠিক জায়গায় এনে রাখল। ঘরের আলো আবার নিষ্প্রভ হয়ে উঠল। যাদুকর প্রাণ তার যাদুদণ্ড সেই কর্তিত রেখার ওপর বোলাতে লাগলেন আর বিড়বিড় করে কি সব বলতে লাগলেন। এবার একটা শিস্ দিয়ে উঠলেন।

…লেডিজ এ্যান্ড জেন্টলমেন, মিস্ পরীর অংশ দুটো জোড়া লেগে গেছে। এখন তাকে তার সম্মোহনের ঘুম ভাঙিয়ে তুলছি।

আবার বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগলেন মিঃ প্রাণ। তারপর সশব্দে হাততালি দিয়ে বললেন, জেগে উঠুন মিস্ পরী, সবাইকে আপনি দেখিয়ে দিন যে, আপনি আবার জীবিত হয়েছেন।

ঘরের আলো আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঘুম থেকে উঠে বসলেস মিস্ পরী। তারপর তড়াক করে সেই স্ট্যান্ডের ওপর থেকে নীচে নামলেন। এবং তারপর গুড্ ইভনিং লেডিজ এ্যান্ড জেন্টলমেন, আই অ্যাম হিয়ার, বলে মাথা ঝাঁকিয়ে বাও করলেন।

স্টান্ড দুটো ও কাঠের তক্তা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। হলের মাঝখানে এসে পাশাপাশি দাঁড়ালেন মিঃ প্রাণ ও মিস্ পরী। চারিদিক করতালি ও প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠল।

এমন সময় সুব্রত এসে তার চেয়ার দখল করে বসল।

চিরন্তন সুব্রতকে লক্ষ্য করে বলল, সুব্রত তোমার দাড়িটা ঠিক করে লাগাও খুলে গিয়েছে, লোকে সন্দেহ করবে।

সুব্রত দাড়িটা টেনে লাগাতে লাগল, হ্যাঁ, বাথরুমে মুখ ধোবার সময় একটু খুলেছিলাম।

হঠাৎ একটা ভীত আর্তনাদ ও গোলমাল শোনা গেল। অসীম তার হাত ঘড়িতে দেখল ঠিক বারোটা। তারপর মুহূর্তেই ঝড়ের গতিতে মিঃ পিটার গোমেজ ঘরে ঢুকে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, লেডিজ এ্যান্ড জেন্টলমেন, আপনাদের কাছে একটা আমি দুঃসংবাদ জানাচ্ছি এবং এইসঙ্গে আজকের অনুষ্ঠানও বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছি। —অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি,— বেলুনগার্ল মিস্ লোভেস্তি তার ড্রেসিংরুমের ভেতর হঠাৎ মারা গেছেন।

চারিদিকে একটা ভয় ও উত্তেজনার চাপা আওয়াজ গুঞ্জরিত হয়ে উঠল।

।। পাঁচ ।।

এই সময় নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল সুব্রত। দুহাতে মুখের গোঁফদাড়ি আর পরচুলাটা খুলে ফেলল। পঞ্চাশোর্ধ বৃদ্ধ মুসলমান ভদ্রলোকের মুখোশের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল এক যুবা পুরুষ—পুলিশ অফিসার সুব্রত সোম। উদাত্ত কণ্ঠে সে বলে উঠল, আমি ক্যালকাটা

আই. বি. ডিপার্টমেন্টের পুলিশ অফিসার মিঃ সুব্রত সোম। আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে পুলিশের অনুমতি ছাড়া আপনারা কেউ এই ঘর বা হোটেলের বাইরে যাবেন না। তারপর সে মিঃ পিটার গোমেজের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, আমি মৃতাকে দেখতে চাই এবং লালবাজারে একটা ফোনও করতে চাই।

ততক্ষণ চিরন্তন সুব্রতর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তার দিকে তাকিয়ে সুব্রত বলল, এস চিরন্তন। তুমি আর আমি বেলুম গার্লকে দেখতে যাই। অসীম আর মিঃ বল এখানে উপস্থিত লোকেদের নজরে রাখুন।

চিরন্তন অস্ফুট স্বরে বলল, হীরা সিং আর তার সঙ্গিনী কিন্তু এখনও ফেরেনি।

ম্যানেজার পিটার গোমেজকে তাদের কথা জিজ্ঞাসা করাতে ভয়ে ভয়ে তিনি বললেন, মিঃ হীরা সিং-এর সঙ্গিনী রেইনেমীও পার্টিরই একজন ক্যাবারে গার্ল। হীরা সিংকে তিনি চেনেন না। তবে হীরা সিং যে প্রচুর ধনী লোক একথা তিনি জানেন।

সুব্রতর নির্দেশে কাঁপতে কাঁপতে মিঃ গোমেজ তাদের ড্রেসিং রুমের দিকে নিয়ে চললেন। সারা ঘরে তখন উত্তেজনা, বিস্ময় ও ভয়ের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। সবাই কানাকানি করছে পার্টিতে মজা করতে এসে এ আবার কি ফ্যাসাদ?

প্রথমেই লালবাজারে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে হোটেল ঈগলে পুলিশ পাঠাতে অনুরোধ জানাল সুব্রত।

ড্রেসিংরুমে পৌঁছে তারা দেখে মিস্ লোভেস্তি একটা সোফার ওপর এলিয়ে পড়ে রয়েছে। পরনে মিনি স্কার্ট। বোঝা যায় যে সে নাচ সেরে এসে তার পোশাক পরিচ্ছদ ছাড়বারও সময় পায়নি। সারা মুখে তার ভয় ও বিস্ময়ের চিহ্ন পরিস্ফুট। চারিদিকে কোথাও রক্তের চিহ্নমাত্র নেই। ধস্তাধস্তি যে হয়েছে তারও কোন প্রমাণ নেই। মিস্ লোভেস্তির পোষাকও অবিন্যস্ত নয়। শুধু সেই পোষাক, তার দেহ এবং তার চুল থেকে ভেসে আসছে তীব্র একটা সুবাস।

তোমার কি মনে হয় চিরন্তন? সুব্রত জিজ্ঞাসা করে।

মনে হয় হত্যাকারীর সঙ্গে মিস্ লোভেস্তির মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগেও হৃদ্যতা-পূর্ণভাবে কথাবার্তা হয়েছিল। সে জন্য ধস্তাধস্তির কোন চিহ্ন নেই; তারপর আগন্তুক তাকে হত্যা করেছে। কিন্তু থাক, চল সুব্রত, এ ঘরটা লকআপ করে রেখে আমরা হলঘরে ফিরে যাই। সকলের জবানবন্দী নিতে হবে।

যখন তারা হলঘরে এলেন তৎক্ষণে লালবাজার থেকে পুলিশও এসে গেছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার মিঃ কর নিজেই এসেছেন। সুব্রতকে দেখে তিনি বললেন, কি ব্যাপার মিঃ সোম, আপনি এখানে ?

সুব্রত সবই খুলে বলল। সে হীরা সিংকে ফলো করবার জন্য এখানে এসেছিল, চিরন্তন আর অসীমকে নিয়ে। তারপর একের পর এক এসব ঘটনা ঘটে গেছে।

হুঁ, মনে হয় হীরা সিং-ই এই জঘন্য কাজটা করেছে।

হীরা সিংয়ের সঙ্গিনীকে হোটেলের মধ্যেই পাওয়া গেল। সে তার জবানীতে বলল হীরা সিং তাকে সেই রাত্রে ড্যান্স করবার জন্য সঙ্গিনী হিসাবে আহ্বান জানায়। সানন্দে সে তাতে রাজী হয়ে হীরা সিং-এর সঙ্গে আসে। মিস্ লোভেস্কির নাচ শেষ হবার আগেই সে কি রকম বিচলিত হয়ে পড়ে। ফলে তাকেও হীরা সিং-এর সঙ্গে বেরিয়ে আসতে হয়। ড্যান্স হলের বাইরে এসে হীরা সিং বলে তার শরীর অত্যন্ত খারাপ লাগছে। সে এখন বাড়ি যাচ্ছে, বলে গুড নাইট জানিয়ে চলে যায়।

হোটেলের অন্যান্য আগন্তুকদের জবানবন্দী নেওয়া হল কিন্তু সন্দেহ করার মত কারুর কাছ থেকে কোন খবরই পাওয়া গেল না।

একটি কথা কিন্তু কেউ জানতে পারল না। সকলে যখন উত্তেজনায় ও আলোচনায় ব্যস্ত, সেই সময় চিরন্তন সকলের অলক্ষ্যে মৃতা মিস্ লোভেস্কির মুঠোর ফাঁক থেকে পাওয়া কয়েক গোছা চুল সযত্নে একটা কাগজে মুড়ে নিজের পকেটে চালান করে দেয়।

পরদিন সকালে সমস্ত কাগজে বড় বড় শিরোনামায় এই চাঞ্চল্যকর নারী-হত্যার রসাল খবর ফলাও বেরোল। কলকাতা শহরের ভেতরে পর পর দুটো নারীহত্যা হয়ে যাওয়ার ফলে পুলিশ কর্তৃপক্ষও বেশ বিচলিত হয়ে পড়লেন।

মিঃ পিটার গোমেজকে গ্রেপ্তার করা হল। বিনা অনুমতিতে মিস্ লোভেস্কির ঐ নগ্ন নাচের ব্যবস্থা করার জন্য। পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টে জানা যায়, মিস্ লোভেস্কিকে কেউ শ্বাসরোধ করে মেরেছে। তার গলায় কোন হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি। মনে হয় হত্যাকারী হাতে গ্লাভস্ ব্যবহার করেছিল।

।। ছয় ।।

সাতদিন পরের কথা। নিজের বাড়িতে বসে সকালের খবরের কাগজের ওপর চোখ বোলাচ্ছিল চিরন্তন। এমন সময় অসীম ঘরে এসে ঢুকল।

রহস্যের কুলকিনারা হল? অসীম বলে।

চারিদিকে অথৈ সমুদ্র; তার মধ্যে কয়েকটা দ্বীপ নজরে পড়েছে খালি। চিরন্তন রহস্যের হাসি হেসে উত্তর দেয়।

দ্বিতীয় মৃত্যুটা কিন্তু প্রথমটার চেয়ে আরও রহস্যজনক, তাই না? অসীম জিজ্ঞাসা করে।

হ্যাঁ, মিস্ লোভেস্তি রাত সাড়ে এগারটা পর্যন্ত আমাদের সামনে নেচে-ছিলেন। আর পোস্ট মর্টেমের রিপোর্টে প্রকাশ যে রাত প্রায় পৌনে বারটার সময় তার মৃত্যু হয়েছে। আর মৃত অবস্থায় তাকে দেখা গেছে রাত বারটার সময়। থেমে থেমে চিরন্তন বলে।

অসীম বলে তার অর্থ হচ্ছে, রাত পৌনে বারোটার সময় কোন অজ্ঞাত আততায়ী, ধরা যাক হীরা সিং তাকে হত্যা করেছে। আচ্ছা একটা কথা আমরা কেউ জানিনা, মিস্ লোভেস্তি যে মৃতা, সর্বপ্রথম একথা কে জানতে পারে?

মিস্ লোভেস্তির অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ড্রেসার মিস্ ওয়াকার মেকআপ-ড্রেসিং-রুমে ঢুকে দেখে মিস্ লোভেস্তি সোফার ওপর এলিয়ে পড়েছেন। মিস্ লোভেস্তিকে ডেকে কোন সাড়া না পাওয়ায় তার মনে সন্দেহ হয় ও সে কাল-বিলম্ব না করে ম্যানেজার পিটার গোমেজকে ঘরে ডেকে নিয়ে আসে।

কিছুক্ষণ থেমে চিরন্তন বলে, কিন্তু একটা প্রশ্ন, হীরা সিং যদি খুন করে থাকে, কি কারণে সে তা করেছে? যদি বলা যায় কামনার তাড়নায় উন্মত্ত হয়ে সে মিস্ লোভেস্তির ঘরে এসেছিল, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে হত্যা করার মত ঝুঁকি সে নেবে কেন? তাছাড়া ধস্তাধস্তির চিহ্নও তো কোথাও নেই!

পোস্ট-মর্টেমের রিপোর্ট ও মৃতার ঘরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে, আমরা বুঝেছি যে মিস্ লোভেস্তির আততায়ীকে বাধা দেবার কোনও চেষ্টাই করেনি। তার মানে আততায়ীর সঙ্গে সে স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলছিল।

এমন সময় চিরন্তনের চাকর এসে খবর দেয় সুব্রতবাবু ওপরে আসছেন।

বলতে বলতে সুব্রত এসে ঘরে ঢোকে। বলে, ভালই হল। চিরন্তন অসীম তোমরা দুজনেই এখানে উপস্থিত আছ। হীরা সিং-এর একটা খবর পেয়েছি। রাজাবাজারের এক বাড়ীতে সে লুকিয়ে আছে। তাকে ধাওয়া করতে আমি এখনই যাব। তোমরাও চল আমার সঙ্গে।

হীরা সিংকে ধরতে পারলে আমরা মিস্ লোভেস্তির হত্যাকাণ্ডের একটা কিনারা করতে পারব বলে মনে হয়।

কেউ আর কোনও কথা বাড়াল না। তিনজনেই ছদ্মবেশে সুসজ্জিত হল। সুব্রত হল একজন শিখ। চিরন্তন নিল চাকরের বেশ। পরনে তার আধময়লা জামাকাপড়। আর অসীম হয়ে গেল তার মাড়োয়াড়ী মালিক।

সুব্রত আগেই আয়োজন করে রেখেছিল। রাস্তায় নেমে সে পূর্ব নির্দিষ্ট একটা ট্যাক্সির ড্রাইভারের আসনে উঠে বসল।

তার পাশে চাকর বেশী চিরন্তন। আর পেছনের সিটে হেলান দিয়ে থাচে বুজে বসে রইল অসীম।

ট্যাক্সি চলাতে লাগল সুব্রত, ঝড়ের গতিতে শেয়ালদার দিকে। শেয়ালদা স্টেশনের মোড় আসতেই ট্রাফিক পুলিশ হাত দেখাল। সুব্রত দুবার হর্ণ দিল।

চিরন্তন দেখল, হ্যারিসন রোড থেকে একটা গাড়ী বেরিয়ে আপার সারকুলার রোড দিয়ে যেতে লাগল। সে আশ্চর্য হল ড্রাইভারকে দেখে।

সুব্রত ফিস্ ফিস করে বলল, পিটার গোমেজকে চিনতে পারলে? ও জামিনে খালাস পেয়েছে। পিটার এখন চলেছে হীরা সিং-এর কাছেই। আমি আগেই খবর পেয়েছিলাম। পিটারের সঙ্গে গোমেজের গোপনীয় লেনদেন আছে। দুজনকেই হাতে নাতে ধরতে হবে।

পিটারের অ্যাম্ব্যাসাডার স্বর্ণময়ী রোড ধরে আপার সারকুলার রোড ছেড়ে ডানদিকে ঘুরল। পেছনে কতকগুলো রেলওয়ে কোয়ার্টার চোখে পড়ল।

গাড়ীটা আবার বাঁদিকে বাঁকল তারপর গ্যাস স্ট্রীটের কাছাকাছি এসে গাড়ীটা পার্ক করল।

পিটার ক্ষিপ্রগতিতে গাড়ী থেকে নেমে ডান দিকের একটা গলিতে ঢুকল। সুব্রতর ট্যাক্সিটা ঠিক পিটার গোমেজের গাড়ীর পেছনে এসে থামল। চিরন্তন লক্ষ্য করল পিটার গাড়িটার চাবিটা না নিয়েই চলে গিয়েছে।

রাস্তার লোক চলাচল কম হলেও জনবিরল ছিল না। কেশব সেন স্ট্রীটের

মুখে দাঁড়িয়ে ছিল একটি ছেলে, তার হাতে একগাদা হাড়ের রিং, আর সামনে উঁচু স্ট্যাণ্ডের ওপর বসে ছিল লম্বা ঠোঁটওয়ালা একটি ধনেশ পাখি।

ছেলেটি সেই হাড়ের রিংগুলো বিক্রি করছিল। পথচারীদের উদ্দেশ্য করে সে বলছিল,—ধনেশ পাখির মন্ত্রপূত এই রিংগুলির দাম মাত্র চার আনা। বাতে···গাঁটের ব্যাথায়—দেহের যে কোনরকম কিক্ ব্যথায় এই হাড় ব্যবহার করলে নিরাময় অব্যর্থ।

পথচলতি দুএকজন লোক কৌতূহলী হয়ে তার কাছ থেকে হাড়ের রিং গুলো কিনছিল। নেবার আগে ধনেশ পাখিকে বলছিল ছেলেটি, বাবা ধনেশ পাখি···একবার আশীর্বাদ দিন তো। দাঁড়ের ওপরে বসা ধনেশ পাখিটি সঙ্গে সঙ্গে এক পা তুলে সেই রিংগুলো চেপে ধরে পরক্ষণেই ছেড়ে দিচ্ছিল।

ছেলেটিকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, সে বেশ চতুর। তারদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, হঠাৎ চিরন্তনের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ছেলেটার খুব কাছে এসে সে বলল, আমাকে একটা রিং দাও তো ভাই।

হাড়ের রিংটা নিয়ে চিরন্তন ছেলেটির হাতে একট দশ টাকার নোট গুঁজে দিল। ছেলেটি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই চিরন্তন তার কানে কানে বলল, আমরা তিনজনেই পুলিশের লোক। আমরা তোমার সাহায্য চাই।

ছেলেটি চটপট উত্তর দেয়, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ; কিন্তু কিভাবে আপনাদের সাহায্য করব বলুন ?

দেখ ঐ সামনের গাড়ি দুটোয় আমরা ছাড়া যদি কেউ চড়তে যায় তাহলে তাকে বাধা দেবে। আর যদি কোন লোক এই গলির মধ্যে ঢোকে, তবে তাকেও চোখে চোখে রাখবে। আর ঠিকমত কাজ করতে পারলে ভাল বকশিস পাবে।

ছেলেটির নাম রামু। রামু রাখা দাঁড়িয়ে সায় জানিয়ে গলিটার মোড়ের পাহারার ভার নিল।

সেটা ব্লাইণ্ড লেন। সবশুদ্ধ বোধহয় গোটা দশমাত্র বাড়ি। গলিটার একেবারে শেষ বাড়িটায় গিয়ে সুব্রত দরজার কলিং বেল টিপল। পিটার গোমেজকে তারা সেই বাড়িতে ঢুকতে দেখেছিল।

একটা অল্পবয়সী চাকর এসে দরজটা খুলল !—কাকে চান ? প্রশ্ন করে।

দ্যাখ, আমরা এই বাড়িটা বিক্রী আছে শুনে দেখতে এসেছি। তারপর অসীমকে দেখিয়ে বলল, আমাদের সঙ্গে শেঠ আগরওয়ালা এসেছেন উনি বাড়িটা কিনতে চান।

ছেলেটি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার শিখবেশী সুব্রতর দিকে তাকায়।

চিরন্তন তৎক্ষণাৎ বলে, ও আমাদের ট্যাক্সি ড্রাইভার। ওকে আমরা এখানেই ছেড়ে দেব।

আচ্ছা আপনারা বসুন। নীচের একটা ছোট্ট ড্রইংরুমে তারা বসল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ছেলেটি ওপরে খবর দিতে গেল। কিছুক্ষণ বাদে এসে সে বলল, আপনারা দুজনে ওপরে আসুন। বাবু ডাকছে।

ওপরের ঘরে চিরন্তন ও অসীম উঠে দেখে, হীরা সিং ও পিটার গোমেজ দুটো মুখোমুখি চেয়ারে বসে আছে। ঘরের এক কোণে হীরা সিং-এর বিছানা। সে একটা ড্রেসিং গাউন পরে ছিল।

আইয়ে জি, আইয়ে জি, বলে আগরওলাকে ডেকে অভ্যর্থনা করে হীরা সিং বলল, চাকরটার মুখে শুনলাম আপনারা বাড়ী কেনার জন্য এখানে এসেছেন। কিন্তু এ বাড়ীতো বিক্রী নেই।

চাকর বেশী চিরন্তন বলে, সেকি? আমরা খবর পেলাম এ বাড়ীটা বিক্রী হবে। শেঠজীকে নিয়ে তাই আমি এলাম। আমি বাড়ির দালাল।

এমন সময় শিখ বেশী সুব্রত এসে ঘরে ঢুকে বাবুজী বহুৎ দের হোতা হ্যায়, ট্যাক্সিকো। ছোড় দিজিয়ে। কিতনা দের্ তক্ ম্যায় ইন্তেজার করেঙ্গে।

সুব্রতকে দেখে ও তার এলা শুনে হীরা সিংয়ের চোখে মুখে হঠাৎ কি রকম যেন একটা পরিবর্তন এল। সে তাড়াতাড়ি জানালার কাছে সরে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সুব্রত এগিয়ে এসে পিস্তল উঁচিয়ে বলল, পালাবার চেষ্টা করবেন না, মিঃ হীরা সিং। আপনাকে আমরা অ্যারেস্ট করছি।

ক্ষিপ্রগতিতে হীরা সিং অতর্কিতে বিছানায় রাখা কম্বলটা সুব্রতর মুখের ওপর ছুঁড়ে দিল। মিঃ পিটার গোমেজও পালাবার চেষ্টা করছিল। অসীম সবেগে এগিয়ে গিয়ে তাকে জাপটে ধরল।

এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই যেন কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে। ৩ৎক্ষণে গরাদবিহীন জানালা দিয়ে বেরিয়ে জলের পাইপ বেয়ে হীরা সিং পালিয়ে গেছে।

চিরন্তন ছুটে এসে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে হীরা সিং করিডোরে নেমেই ছুটে গলি দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আর দেরী নয়। পিটার গোমেজের হাত দুটো ভাল করে বেঁধেই তারা নেমে এল নীচে।

হীরা সিং বাইরে এসেই অ্যাম্বাসাডার গাড়িটা দেখে তাতে উঠে পড়েই স্টার্ট

দেয়। গলির মুখে দাঁড়ানো রামু সঙ্গে সঙ্গে হীরা সিংকে বাধা দেয়। কিন্তু হীরা সিং তার মুখে এক ঘুঁসি মারতেই সে ছিটকে মাটিতে পড়ে যায়। গাড়ির ইঞ্জিন তখন স্টার্ট নিয়ে গরর্ গরর্ করছে।

এখন সময় রামুর হাত থেকে ছাড়া পাওয়া সরু চেনে বাঁধা ধনেশ পাখীটা উড়ে এসে হঠাৎ লম্বা ঠোঁট আর নখ দিয়ে হীরা সিংয়ের গলা, গাল ঠুঁকরে ঠুঁকরে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে। মনিবের হেনস্থা সে সহ্য করতে পারে নি। হীরা সিং যতবার স্টিয়ারিং ধরতে যায়, ততবারই পাখিটা উড়ে এসে আঘাত করে। এমন সময় সুব্রত আর চিরন্তন এসে হীরা সিংকে অ্যারেস্ট করে। তাকে বন্দী করে সেই বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে তল্লাসী করে তারা ভাল ভাল স্মাগলড্ সোনা পায়।

কিন্তু মিঃ পিটার গোমেজ ও হীরা সিংকে হাজার জেরা করেও মিস্ লোভেস্তির হত্যাকাণ্ডের সম্পর্কে কিছুই বের করা গেল না। ঐ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তারা বিন্দু বিসর্গও জানে না।

জেরার চোটে হীরা সিং স্বীকার করল, সে সেই পার্টিতে সুব্রতকে পুলিশের লোক বলে চিনতে পেরেই ভয়ে বাইরে পালিয়ে আসে। করিডোর দিয়ে যেতে যেতে সে মিস্ লোভেস্তিকে একজন দীর্ঘকায় পুরুষের সঙ্গে তার ড্রেসিংরুমে কথা বলতে দেখে। পুরুষটি পিছন ফিরে ছিল। তাড়াতাড়িতে সে তাকে চিনবার চেষ্টাই করেনি। তবে তার গায়ে একটা নীল রংঙের সার্জের স্যুট ছিল সেটা সে লক্ষ্য করেছে।

[সাত]

একমাস পরের কথা। তখন ভোর পাঁচটাও বোধহয় বাজেনি। মতিলাল নেহরু রোড ধরে উর্ধশ্বাসে ছুটে আসছিল সুপ্রিয়া রায়চৌধুরী। তার গন্তব্যস্থল রিচি রোডের মোড়ে অসীম মুখাজীর বাড়ি।

অসীমের দরজায় কড়া নাড়তেই চোখ রগড়াতে রগড়াতে তার চাকর এসে দরজা খুলল।

অসীম কাকাকে শিগ্গির খবর দাও। উত্তেজিত স্বরে সুপ্রিয়া বলে।

ওপরে গিয়ে অসীমকে ডেকে তোলে সে।

অসীম তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসে। জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে সুপ্রিয়া এত ভোরে ?

খুন হয়েছে অসীম কাকা ! আবার মেয়েছেলে খুন হয়েছে।

সে কি ! কে খুন হল ? প্রচণ্ড বিস্ময়ে অসীম জিজ্ঞাসা করে।

প্রশ্নের উত্তরে সুপ্রিয়া যা জানাল তা হচ্ছে, সুপ্রিয়ার দাদা খোকনের রোজ ভোরে লেকের ধারে বেড়াতে যাওয়া অভ্যেস। রোজকার মত সেদিনও সে বেড়াতে গিয়েছিল। গিয়ে দেখে লেকভিউ রোড আর সাদার্ণ এভিন্যুর সংযোগস্থলের মাঝখানের আইল্যাণ্ডে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন এক ভদ্রমহিলা। সে দেখেই ভয় পেয়ে যায়।

ভোরের আলো তখনও ভাল করে ফোটেনি। সে প্রথমে ভেবেছিল ভদ্রমহিলা বোধহয় লেকে বেড়াতে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেন। খোকন সাহস করে ভদ্রমহিলাকে চিৎ করে শুইয়েই চমকে ওঠে : ভদ্রমহিলার মুখটি তার পরিচিত। তিনি স্থানীয় এক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। সঙ্গে সঙ্গে সে পড়ি কি মরি করে সোজা বাড়িতে ছুটে এসে খবর দেয়।

খবর শুনেই সুপ্রিয়া উর্ধ্বশ্বাসে অসীমের কাছে ছুটে এসেছে। তার পিছু পিছু অবশ্য খোকনও সেখানে তৎক্ষণে এসে পৌঁছেছে।

অসীম আর দ্বিধা না করে সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তন ও সুব্রতকে ফোন করে ঘটনাটি জানায় ও তাদের অকুস্থলে আসতে অনুরোধ জানায়।

একটা ট্যাক্সি করে অসীম লেকভিউ রোড আর সাদার্ণ এ্যাভিনিউর সংযোগস্থলে খোকনকে নিয়ে এসে পেঁছায়। মৃতদেহটা তখনও একইভাবে চিৎ হয়ে পড়েছিল।

অসীম তার গায়ে হাত দিয়ে বোঝে, বেশীক্ষণ আগে তিনি মারা যান নি। ভদ্রমহিলার দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। ধস্তাধস্তিরও কোন চিহ্ন নেই। শাড়ি, গয়না, মায় কানের দুলটি পর্যন্ত অবিকৃতভাবে রয়েছে। তৎক্ষণে চিরন্তনকে নিয়ে সুব্রত সেখানে পেঁছেছে।

চিরন্তন নীচু হয়ে ভদ্রমহিলাকে পরীক্ষা করতে থাকে। আর তার নাকে ভেসে আশে মিষ্টি একটা সেন্টের গন্ধ। যেটা তার অত্যন্ত পরিচিত।

সুপ্রিয়ার দাদাকে জিজ্ঞেস করে চিরন্তন জানতে পারে, মৃতা ইন্দ্রানী বসাক, স্থানীয় স্কুলের শিক্ষিকা। ঢাকুরিয়ায় থাকেন। অবিবাহিত। তাদের সঙ্গে স্বল্প পরিচয় ছিল। বোধহয় টিউশানি সেরে একটু বেশী রাত্রে সাদার্ণ এভিন্যু দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময় আততায়ী তাকে হত্যা করে।

তখন ভোর সাড়ে পাঁচটা হয়ে গেছে। রাস্তা দিয়ে লোকজন চলাচল শুরু হয়েছে। বেশীরভাগই স্বাস্থ্যান্বেষী প্রবীণেদের দল।

সাদার্ণ এভিন্যুর দক্ষিণে কতকগুলো খোলার চালের বাড়ি ছিল। সেখান থেকে কয়েকজন যুবক বেরিয়ে এসে তাদের চারিদিকে ঘিরে ভীড় করছিল। তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ বলে ওঠে, এরকম দেখতেই এক ভদ্রমহিলা কাল রাত্তিরে বারোটা নাগাদ এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। পশ্চিম দিক দিয়ে হঠাৎ একটা কালো রংয়ের ছোট্ট গাড়ি এসে ওঁর পাশে দাঁড়ায়। তারপর যিনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন তার সঙ্গে কিসব যেন কথাবার্তা হয় ভদ্রমহিলার। সে অপরদিকের ফুটপাতে থাকায় তাদের কোন কথাবার্তা শুনতে পায় নি। তারপরই ভদ্রমহিলা গাড়িতে উঠে বসেন ও ভদ্রলোক তাকে নিয়ে সাদার্ণ এভিন্যু দিয়ে গোলপার্কের দিকে চলে যান।

সুব্রতর প্রশ্নের উত্তরে যুবকটি বলে ভদ্রলোকের মুখ রাত্তিরের অন্ধকারে ভালভাবে দেখতে পাওয়া না গেলেও মনে হয় ভদ্রলোক বেশ লম্বা ও স্বাস্থ্যবান।

এরপর খোকনকে তার বাড়িতে পেঁছে দিয়ে অসীম ও চিরন্তনকে নিয়ে সুব্রত তার টালিগঞ্জের টিপু সুলতান রোডের বাড়িতে এল।

সুব্রতর এটা নিজস্ব ফ্লাট ছিল। সেলফ্ কনটেন্ড ফ্ল্যাট। একতলাতেই। বাড়িটা যদিও দোতলা। হাল ফ্যাশানের সাজানো ড্রইংরুম। অ্যাটাচড্ বাথরুম। এই দুখানি ঘর ছাড়া একটা কিচেন ও ডাইনিং স্পেস। ছিমছাম ফিটফাট। দেখলেই গৃহস্বামীর মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

সুব্রত তাদের ড্রইংরুমে বসিয়ে দিয়ে বাড়ির ভেতরে গেল। একটু পরেই সুব্রতর খাস চাকর বনমালী ট্রেতে করে ধূমায়িত চা ও টোস্ট নিয়ে ঘরে ঢুকল।

এমন সময় ড্রইংরুমে রাখা ফোনটা বেজে উঠতেই সুব্রত ফিরে এসে ফোনটা ধরে। এই অবসরে চিরন্তন বলে, আমি একটু বাথরুম হয়ে আসি।

হ্যাঁ বেশ তো যাওনা, হাত মুখ ধুয়ে এস। সুব্রত বলে।

বেড অ্যাটাচড্ বাথরুম। ডাইনিং স্পেস পেরিয়ে সুব্রতর বেডরুম হয়ে বাথরুমে যেতে হয়। সুব্রতর বেডরুমে ঢুকে চিরন্তন দেখতে পেল বিছানার ওপর দেওয়ালে টাঙানো একটা ফটো; বোধহয় সুব্রতর মৃতা মায়ের। একটা গডরেজ আলমারি, তার পাশে প্রমাণ সাইজের আয়না, তার পাশের সেলফে

দুটো তাক। ওপরের তাকে রেডিও, নীচের তাকে সাজানো একগাদা কসমেটিকস্ চিরন্তনের চোখ কেন জানি এক জায়গায় আটকে গেল। সে চট করে সেখান থেকে একটা ছোট শিশি তুলে নিল। তারপর সে বাথরুমে ঢুকল।

বাথরুম ও বেডরুমটা দেখলেই বোঝা যায় সেটা রুচিমত সাজানো। ওয়াশিং বেসিনের ঠিক ওপরেই টাঙানো একটা আয়তাকার আয়না। তার সেলফে দাঁড়ি কামানোর সরঞ্জাম।

চিরন্তন হাত মুখ ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ মোছবার সময় দেখতে পেল বাথরুমের ভেতরকার একটা সেলফে পড়ে রয়েছে হোটেল ঈগলে পরিহিত সুব্রতর সেই পরচুলা ও দাড়ি।

হাত মুখ ধুয়ে সে যখন ড্রইংরুমে এসে ঢুকল তখন সুব্রতর ফোন করা সবে শেষ হয়েছে। সে গম্ভীর মুখে বলল, টালিগঞ্জ থানার ও. সি. মিঃ বসু ফোন করছিলেন। তিনি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। এখনই এখানে আসছেন।

সকলেরই মুখ থমথমে। শুধু চিরন্তন যেন গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন। কিছুক্ষণ বিরতির পর সুব্রত বলল, কাগজওয়ালারা আমাদের অপদার্থ বলছে। দুটো নারীহত্যার এখনও কোন কিনারাই হল না। তারপর আবার এই একটা নতুন নারী-হত্যা। চিরন্তন, তুমি কি এই সব মাথামুণ্ডু হীন খুনের কোন কিনারা করতে পাচ্ছ?

চিরন্তনের গভীর চিন্তার জাল যেন ছিন্ন হয়ে গেল। সে অবসাদ গ্রস্তের মত বলতে লাগল, হ্যাঁ খুনী যে কে তা আমি বোধহয় ধরতে পেরেছি, কিন্তু সে যে কেন খুন করছে তা আমি এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

এ্যাঁ?······খুনী কে তুমি জানো? অসীম বিস্ময়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

ধীরে বন্ধু ধীরে। আমরা একটা জটিল, গোলক ধাঁধার মধ্যে ঘুরছি। তার কেন্দ্রবিন্দুতে এখনও পেঁছাতে পারিনি। সেই কেন্দ্রবিন্দুতে যখন পেঁছাব, তখনই খুনীকে হাতে নাতে ধরতে পারব।

কিন্তু চিরন্তন, তুমি খুনীকে জেনেও, বন্ধু হয়ে আমাকে বলছ না কেন; আমার তো মানসম্মান বজায় রাখা দায় হয়ে উঠল। তোমার কৃতিত্বের একটু ভাগ আমাদের পেতে দাও। বিশেষ করে চাকরি রাখতে গেলে আমার তা একান্তই জানা প্রয়োজন।

চিরন্তন কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় সশব্দে দরজায় নক্ হল।

সে থেমে গেল। সুব্রতর নির্দেশে বনমালী গিয়ে দরজাটা খুলতেই, টালিগঞ্জ থানার ও. সি. মিঃ বসু এসে ঘরে ঢোকেন।

তার চুলগুলো উস্কোখুস্কো ও মুখ শুকনো। সুব্রতর আহ্বানে মিঃ বসু একটা সোফা দখল করে বসেন। তারপর একটু দম নিয়ে তিনি বলতে থাকেন, ভোরবেলায় আপনার ফোনটা পাবার পরই আমি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম, লাশটাকে মর্গে চালান করে দিয়েছি। আপনার কথামত মৃতা ইন্দ্রানী বসাকের বাড়িতে খবর নিয়েছিলাম। ইন্দ্রানীর বাবা রিটায়ার্ড কেরানী। ছোটভাই বাঙলার জুনিয়ার ব্যাডমিটন্ চ্যাম্পিয়ান। তারা বলল দিদি ফিরতে প্রায়ই দেরী করত। তাদের সংসারের খরচ মিস বসাকই বহন করতেন। তাকে রাত্তিরে দুটো টিউশানি করতে হত। অবশ্য রাত বারটার আগেই তিনি বাড়ি ফিরে আসতেন।

মিস্ বসাক যে বাড়ীতে টিউশানি করতেন আমি সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম। সেটা শরৎ ব্যানার্জী রোডের এক ডাক্তারের বাড়ি। ডাক্তারের মেয়েকে মিস্ বসাক পড়াতেন। তাদের বাড়িতে তার নেমন্তন্ন ছিল সেদিন। সেইজন্য সেদিন ফিরতে তার একটু দেরী হয়।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, মৃতা মিস্ বসাক গতকাল রাত্তিরে শরৎ ব্যানার্জী রোড থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে যখন ফিরছিলেন, সেই সময়ই তাকে কোন এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি গাড়ি থামিয়ে তুলে নেয়। পরে মিস্ বসাককে সাদার্ন এ্যাভিনুয়তে মৃতাবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। সুব্রত থেমে থেমে বলে।

প্রশ্ন উঠবে, মিস্ বসাককে কখন খুন করা হয়েছে এবং কোথায়? চিরন্তন মৃদুস্বরে প্রশ্ন করে।

চিরন্তনদের সঙ্গে মিঃ বসুর আগেই পরিচয় হয়েছিল। চিরন্তনের প্রশ্নের জবাবে মিঃ বসু বললেন, আমার ধারণা মিস্ বসাককে খুন করে ঐ জায়গায় ফেলে আততায়ী পালিয়ে যায়। খুনটা রাত বারোটা থেকে ভোর চারটের মধ্যে কোন এক সময়ে হয়েছে।

আকুস্থলে খুনটা হয়নি তা আপনি জানলেন কি করে? অসীম জিজ্ঞাসা করে এতক্ষণে।

তার কারণ, গোলপার্কের কাছের বিটে ঐ দিন রাত্রে যে কনস্টেবল মোতায়েন ছিল তাকে আমি ভাল করে প্রশ্ন করেছি, ঐ সময় ঐ ধরনের আরোহী সমেত কোন গাড়িকে সে যেতে দেখেনি। তাছাড়া আশেপাশের পায়ের ছাপ এবং

মৃতদেহ যে ভাবে পড়েছিল তা দেখে মনে হয় না যে তাকে ঐ জায়গায় কেউ খুন করেছে।

গম্ভীর গলায় চিরন্তন বলে ওঠে· মিঃ বসুর এই যুক্তিকে আমিও মানতে বাধ্য হচ্ছি। বিটের কনেস্টেবলের রিপোর্ট খুব নির্ভরযোগ্য না হলেও, একথা জোর দিয়ে বলা যায়, আততায়ী অকুস্থলে মিস্ বসাককে খুন করে পালিয়ে যায় নি। মৃতা মিস্ বসাকের দেহটা ঐ জায়গায় ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছিল তার মৃত্যুর পর। কারণ ঐ সময় যদি তাকে ঐ জায়গায় খুন করা হত, তাহলে তার চিৎকার বা কাতোরক্তি আশেপাশের বাসিন্দাদের আকৃষ্ট করত। জায়গাটা একেবারে জনবিরল নয়। সাদার্ণ এভিন্যুর দক্ষিণদিকের খোলার চালার বাসিন্দারা রাত্রিরে কাজে অকাজে ওখানেই প্রায়ই ঘোরাফেরা করে।

মিঃ বসু আবার বলে ওঠেন, আমি ঢাকুরিয়া ব্রিজের ওপাড়ায় পাহারারত কনস্টেবলকেও জিজ্ঞাসা করেছি ; সেও কোন গাড়ী বা আরোহীদের ব্রিজ দিয়ে যেতে দেখেন নি, এ সময়ে।

মিঃ বসু আপনার অনুসন্ধান সত্যই প্রশংসনীয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে যে সব খবর আপনি যোগাড় করেছেন তার থেকে বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য আমি জানতে পারছি।

আত্মপ্রসাদে মিঃ বসুর বুক ফুলে উঠল। তিনি তার গোঁফের প্রান্ত একটা ধরে মোচড়াতে লাগলেন ও সহাস্যে বলতে লাগলেন, না, এ আর এমনকি ? সুযোগ সুবিধা পেলে আমিও খুনীকে ধরতে পারি।

পোস্টমর্টেমের রিপোর্টটা সন্ধ্যার মধ্যেই জানা যাবে তাই না মিঃ বসু ?

হ্যাঁ· তা জানা যাবে।

তাহলে কাল সকালে এই সময় আমরা সুব্রতর ফ্ল্যাটে আলোচনায় বসব। আমি আশা করি খুনীকে ধরতে পারব। তবে কি ভাবে ধরব এখন সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

আপনি খুনীকে চেনেন তাহলে ? বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মিঃ বসু চিরন্তনের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

ফলেন পরিচয়তে। চিরন্তন গম্ভীর গলায় জবাব দেয়।

॥ আট ॥

পরদিন সকালে সুব্রতর ফ্ল্যাটে বসে চিরন্তন, অসীম, সুব্রত খবরের কাগজের ওপর চোখ বোলাচ্ছিল ও নিজেদের মধ্যেই সেই বিষয়ে আলোচনা করছিল।

গতকালকার হত্যাকাহিনী ফলাও করে কাগজে বেরিয়েছে। "কলকাতা শহরে গত তিন মাসের মধ্যে তিনটি ভয়াবহ নারীহত্যা। অপরাধী ধরতে পুলিশের অমার্জনীয় ব্যর্থতা।..."

আমাদের মুখ বাঁচানোর জন্য একটা কিছু কর ভাই। খুনীকে যে করে হোক ধরিয়ে দাও। তুমি যখন তাকে চেনো বলছ। বললে সুব্রত।

কথাটা পুরো না শুনে চিরন্তন বলে, খবরের কাগজের পঞ্চম পৃষ্ঠায় আর একটা ছোট খবর তোমার চোখে পড়েছে কি ?

তোমাদের পক্ষে সেটাও কম আশংকার কথা নয়।

কি ? কি ? অসীম ও সুব্রত একইসঙ্গে যুগপৎ প্রশ্ন করে। এমন সময় মিঃ বসু ঘরে ঢোকায় আলোচনায় ছেদ পড়ে।

পোস্ট-মর্টেমের রিপোর্ট পাওয়া গেছে। রিপোর্টে প্রকাশ মিস্ বসাক রাতে সাড়ে বারোটা থেকে পোনে একটার মধ্যে নিহত হয়েছেন। তাকে শ্বাস-রোধ করে মারা হয়েছে। মৃতার গলায় কোন আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি। মনে হয় গলায় ও মুখে রুমাল চেপে ধরে হত্যাকারী তাকে খুন করেছিল। মিস্ বসাকের সামনের ঠোঁটটা থেঁতলে গিয়েছিল। সেখানে একটু রক্তও জমে ছিল। কণ্ঠাস্থি অথবা থাইরয়েডে কারটিলেজটা খুনীর হাতের চাপে ভেঙে যায়। কথাগুলো এক নিশ্বাসে বলে গেলেন মিঃ বসু।

ধন্যবাদ আপনাকে মিঃ বসু।

...কিন্তু তুমি কি খবর শোনাচ্ছিলে চিরন্তন ? সুব্রত প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, খবরটা আমি পড়ছি। কিছুক্ষণ থেমে কাগজটা খুলে চিরন্তন পড়ে, 'দক্ষিণ কলকাতার-নারীরক্ষা বাহিনী, কলকাতার ভেতরে পর পর তিনটি নারী-হত্যায় আতঙ্কিত, শঙ্কিত, ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়েছেন। গত রাত্তিরে তাদের রাসবিহারী এ্যাভিনুর কমিটির হেড অফিসের অধিবেশনে স্থির হয়েছে, পুলিশের এই অকর্মণ্যতার বিরুদ্ধে ও অবলা নারীদের সচেতন ও রক্ষা করার জন্য তারা চরম ব্যবস্থা নেবেন।

কিরকম ব্যবস্থা নিতে চান ? মিঃ বসু প্রশ্ন করেন।

তা বলতে পারি না, তবে তাদের স্বপক্ষে জনমত যে প্রবল এটা আমাদের পক্ষে সহজেই অনুমেয়।

আচ্ছা, এই তিনটি নারী হত্যাকারী কি একই লোক ? তোমার এ বিষয় কি অভিমত চিরন্তন ? সুব্রত জিজ্ঞাসা করে।

প্রথম নারী হত্যার পর আমার চিন্তাধারা বিপর্যস্ত ছিল। দ্বিতীয় হত্যার পর সেটা একটা সুগঠিত লাইনে চলতে থাকে। দ্বিতীয় হত্যার পরই আমি বলেছিলাম শীগগিরই আর একটা নারীহত্যা সংগঠিত হবে।

অসীম ও সুব্রত দুজনেই একইসঙ্গে বলে, ওঠে ; হ্যাঁ তা বলেছিলে মনে আছে।

তৃতীয় হত্যার পরে আমি বলতে পারি, একই খুনী পরপর তিনটে খুন করেছে এবং তাকে আমি আর একটা খুন করার সময় হাতেনাতে ধরব বলে আশা রাখছি।

এমন সময় একটা শোরগোল শোনা গেল। অনেকগুলো পায়ের শব্দ। এবং পর মুহূর্তেই তীক্ষ্ন শব্দে কলিং বেলটা বেজে ওঠে। সুব্রতর চাকর গিয়ে দরজাটা খুলতেই হুড়মুড় করে জনাকয় যুবতী এসে ঘরে ঢুকল। তাদের পুরোভাগে চব্বিশ-পঁচিশ বয়সের এক অনিন্দ্যসুন্দরী মহিলা। তিনি প্রশ্ন করে উঠলেন, মিঃ সুব্রত সোম কি বাড়ি আছেন ? তার সঙ্গে আমরা কথা বলতে চাই !

সুব্রত প্রথমটা হকচকিয়ে যায়। সে আমতা আমতা করে বলে, আমারই নাম সুব্রত সোম। কিন্তু আপনারা ?

সেই সুবেশা রমণী উত্তর দেন, আমরা নারীরক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে আপনার কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছি। আমি নারীরক্ষা বাহিনীর সেক্রেটারী মিস্ পূর্বা ভাদুরী। আর এঁনারা নারীরক্ষা বাহিনীর মাননীয়া সদস্যা।

কিন্তু কি উদ্দেশ্যে আপনারা আমার কাছে এসেছেন ?

দেখুন সুব্রতবাবু, শহরে পর পর তিনটি নৃশংস নারীহত্যায়, নারী-সমাজ আতঙ্কিত ও নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। তাদের মুখপাত্র হয়ে নারীজাতির রক্ষার সংকল্প নিয়ে আমরা নিজেরাই তাই রুখে দাঁড়াতে চাই। আপনারা কি একটু সাহায্য করতে পারেন, সেটা জানতে চাই—

সুব্রত একটু বিপন্ন বোধ করে পূর্বা ভাদুড়ীর তীব্র ও অপ্রত্যাশিত আক্রমণে।

সুব্রতকে অসহায় দেখে তাকে রক্ষা করার জন্য চিরন্তন বলে, তুমি আমাদের সঙ্গে এঁদের পরিচয় করিয়ে দিলে না তো ?

সুব্রতও বেঁচে যায় এ প্রসঙ্গ পরিবর্তনে। সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, ওহ্, আপনাদের সকলের পরিচয় করিয়ে দিই। বলে অসীম ও মিঃ বসুকে নবাগত অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় চিরন্তন।

চিরন্তনের পরিচয় পেয়ে মিস্ ভাদুড়ীর আক্রমণের ধারাটা যেন একটু ভোঁতা হয়ে যায়। সে বলে চিরন্তনবাবু, আপনার নাম আমি খুব শুনেছি। আপনি এই কেসের ভার নিয়েছেন তা জানতাম না। আপনার কি আগামী-কাল সন্ধ্যায় আমাদের রাসবিহারী এভিনুার অফিসে এসে আপনাদের কার্যধারা সম্বন্ধে কিছু বলে আশ্বস্ত করবেন ?

উত্তরে চিরন্তন বলে, মিস্ ভাদুড়ী, আপনার নাম আমার অজানা নয়। ইউনিভার্সিটির বিতর্কে এক সময়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাশের সেরা বাগ্মী ছিলেন, আমি জানি। ঠিক আছে, আপনাদের দপ্তরে আগামীকাল যাব।

চিরন্তনের মিষ্টি কথায় কাজ হয়। মিস্ ভাদুড়ী দলবল নিয়ে প্রস্থান করলেন।

তাদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে সুব্রত বলে, চিরন্তন, তুমি আমাকে যে উপস্থিত বিপদের হাত থেকে বাঁচালে সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। এ কেসের ভার নিয়ে আমার সর্বনাশ হয়েছে। কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না কে এই খুন করেছে ? আর কেনই বা করছে ?

সুব্রতর কথা শুনে চিরন্তন একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

পরদিন রাত আটটায় রাসবিহারীর এভিনুার নারী রক্ষা বাহিনীর অফিস ভবনে এসে পেঁছাল সুব্রতর স্ট্যান্ডার্ড টেন গাড়ী। তার সঙ্গে এসেছে ও. সি. মঃ বসু, চিরন্তন আর অসীম।

যথারীতি সভার কাজ শুরু হল। সভাপতি মিসেস্ মৃদুলা সেন স্থানীয় এক কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল। বর্ষীয়সী মহিলা। তিনি গুরুগম্ভীর গলায় নারীরক্ষা বাহিনীর উপযোগিতা ও কর্তব্য সম্বন্ধে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা ও তাদের কাজের ফিরিস্তি দিলেন। বক্তৃতা শেষে ঘোষণা করলেন, পুলিশ বাহিনীর যারা এই কেসটা হাতে নিয়েছেন আজ আমাদের মধ্যে তারা আনঅফিসিয়ালি উপস্থিত আছেন। তাদের আমি অনুরোধ জানাব তারা

আমাদের এমন কিছু বলুন যাতে আমরা আশ্বস্ত হতে পারি। এবং ভদ্র নারীরা পথে ঘাটে নিরপদে চলাফেরা করতে পারেন।

সেক্রেটারী মিস্ পূর্বা ভাদুড়ীও সেই একই কথা বললেন। তারপর তিনি আরও বললেন, আমাদের পুলিশের লোক ছাড়া প্রসিদ্ধ ডিটেকটিভ শ্রীচিরন্তন চ্যাটার্জী এবং তার সহকারী অসীম মুখার্জীও আছেন। তারাও এই রহস্যময় হত্যাকারীকে ধরবার জন্য তৎপর আছেন। আমাদের ভরসা দেওয়ার জন্য আমি তাদের কিছু বলতে অনুরোধ করছি।

সুব্রত আর মিঃ বসু দু-চার কথায় তাদের বক্তব্য পরিষ্কার ভাবে রাখলেন। বললেন, তারা পুলিশে চাকরী করেন বটে, কিন্তু দেবতা নন। যাদুকরও নন যে ভোজবাজী দেখিয়ে খুনীকে ধরতে পারবেন। তবে তারা তাদের সাধ্যমত চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাদের বিশ্বাস খুনী একদিন ধরা পড়বেই।

এরপর সকলের অনুরোধে চিরন্তন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চোখ থাকলেই মানুষ দেখতে পায় না। দেখতে গেলে মন চাই। 'Eyes do not see when mind does not know স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বিখ্যাত ডিটেকটিভরা অতি সামান্য জিনিসের সাহায্যে অনেক বড় বড় রহস্যের কিনারা করেছিলেন। কারণ তাদের দেখবার চোখ ছিল। আমি গর্ব করছি না, কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছি যে, খুনের রহস্য আমি বারো আনা ভেদ করেছি এবং আর সাতদিনের মধ্যেই খুনীকে ধরতে পারব বলে দৃঢ় মত পোষণ করছি।

চারদিকে করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠল। মহিলা মহলের আবেগকম্পিত জয়ধ্বনিতে অসীমের বক্ষ হল প্রসারিত। ···কিন্তু সে দুরুদুরু মনে ভাবতে লাগল, চিরন্তন তার এই প্রতিজ্ঞা বজায় রাখতে পারবে তো?

দিন দুই পরের কথা। চিরন্তনের ফ্ল্যাটে সেদিন সন্ধ্যায় আর এক নতুন অতিথি এসেছে। মিস্ পূর্বা ভাদুড়ী। অসীমও সেখানে বসেছিল।

চিরন্তন বলছিল, মিস্ ভাদুড়ী, আমার মাথায় একটা প্লান এসেছে। আপনার সাহায্যের প্রয়োজন।

কিভাবে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি বলুন। পূর্বা ভাদুড়ী সোফার ওপর একটু এলিয়ে পড়ে বলেন।

একটু আত্মগতভাবে চিরন্তন বলতে থাকে, দেখুন মিস্ ভাদুড়ী, খুনী কে তা আমি জানি, কিন্তু খুনী নিজেকে জানে না।

সে আবার কি ? মিস্ ভাদ্দুড়ী আর অসীম দুজনেই একসঙ্গে বলে ওঠে।

দেখুন মিস্ ভাদুড়ী, আপনার বাড়ীতে আগামীকাল রাত্রেই খুনী এসে হাজির হবে। এবং আমি আর অসীম আপনার ড্রইং রুমে বা আলমারীর পেছনে লুকিয়ে থাকব। খুনী আপনাকে আক্রমণও করতে পারে। কিন্তু আপনি ভয় না পেয়ে সেজন্য প্রস্তুত থাকবেন।

পূর্বা ভাদুড়ীর মুখে ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বলে, এত বড় ঝুঁকি আমাকে নিতে হবে বলছেন ?

হ্যাঁ, তবে আপনার যাতে কিছু না হয় সেজন্য আমরা প্রস্তুত থাকব।

[নয়]

পরের দিন রাত্তিরে কেয়াতলার ফ্ল্যাটের বাড়িটা সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুজিয়ে রেখেছেন মিস্ পূর্বা ভাদুড়ী। সেখানে একটা ছোট পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। পার্টি না বলে বরং জলসাই বলা উচিৎ, কারণ লোকজন দশ-বারোজনের বেশী ছিল না। তাতে অন্যদের মধ্যে চিরন্তন, অসীম, ও মি· বসুও আমন্ত্রিত হয়েছেন।

দু-কামরার ফ্ল্যাট। সাততলা বাড়ীর তিন তলায়। প্রতি তলায় দুটো করে ফ্ল্যাট। মাঝখান দিয়ে লিফট ও সিঁড়ি চলে গেছে। দরজা লক করে দিলে ভেতর থেকে চিৎকার করলেও বাইরে কারুর শোনার সম্ভাবনা কম। প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকেই একটা বড় ড্রইংরুম। তার একদিকে একটা ছোট রুম। সেখান থেকে একটা করিডোর গিয়ে পড়েছে মিস্ ভাদুড়ীর বেডরুমে। বেডরুমটার সঙ্গে অ্যাটাচড্ বাথরুম ও আর একদিকে একটা ব্যালকনি। ব্যালকনিতে দাঁড়ালে সাদার্ণ এভিনু্য আর লেক চোখে পড়ে।

ফ্ল্যাটে পূর্বা তার বিধবা মায়ের সঙ্গে একাই থাকতেন এবং প্ল্যানমত মিস্ ভাদুড়ী তার মাকে সে রাত্রে মাসীর বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পূর্বা ভাদুড়ী বরাবরই সাহসী মেয়ে ছিলেন। একা থাকতে অভ্যস্ত।

খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির পর পার্টি ভাঙতে ভাঙতে রাত দশটা বেজে গেল। সবাই এক এক করে গুড নাইট জানিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল। শুধু বসে রইল, মি· বসু, অসীম, সুব্রত ও চিরন্তন।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে চিরন্তন বলল, মিস্ ভাদুড়ী, আমাকে আর অসীমকে

একটু মাফ করতে হবে। আমাদের একডালিয়া রোডে একটু কাজ আছে। আমরা একটা ট্যাক্সি ডেকে সেখানে যাচ্ছি।

অসীম ও চিরন্তন চলে যাবার পর মি. বসু ও সুব্রত পূর্বা ভাদুড়ীর সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। মিস্ ভাদুড়ী প্রগলভা না হলেও রসালাপে অভ্যস্তা ছিলেন। মি. বসুও মজলিশী লোক। তিনিও তার পুলিশী জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শোনাচ্ছিলেন। রাত সাড়ে দশটা বাজলে তিনি বললেন, সুব্রতবাবু, মিস্ ভাদুড়ী আমাকে মাফ করবেন, যাদবপুর পুলিশ স্টেশনে একবার আমাকে যেতে হবে।

তারপর মিস্ ভাদুড়ীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি চলে গেলেন।

তার গমনের পথের দিকে সুব্রত আনমনে তাকিয়ে থাকে। সে এতক্ষণ চুপ-চাপই বসে ছিল। খুব বেশী কথা বলে নি। মিস্ ভাদুড়ী তারপার্টিতে একটা ঠাণ্ডা পানীয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। তারই ঘোরে সে বোধহয় আচ্ছন্ন ছিল।

দূরাগত ট্রামের ঘড়্ঘড়্ ধ্বনি মৃদু তালে ভেসে আসে। লেকের ধার দিয়ে একটা ট্রেন চলে গেল। চারদিক নিস্তব্ধ থাকায় ইঞ্জিনের শব্দ ও রেলের গুম্ গুম্ আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল।

কি এত ভাবছেন মি. সোম? আপনি হঠাৎ বড় গম্ভীর হয়ে গেছেন। সুব্রতর সোফার হাতলের কাছ ঘেঁসে দাঁড়াল পূর্বা ভাদুড়ী।

পুলিশের নিন্দে করি বলি বলেই বুঝি আপনি গম্ভীর হয়ে গেছেন? হাসতে হাসতে পূর্বা ভাদুড়ী সুব্রতর সোফার হাতলের ওপর বসে পড়ে।

'কবরী' থেকে পূর্বা ভাদুড়ী সেদিন সন্ধ্যায় খোঁপা বেঁধে এসেছেন। তার চুলের ভেতর থেকে একটা মিষ্টি সুবাস ভেসে আসে। তার শিথিল ভঙ্গিতে বসাটা একটা মাদকতার আমেজ আনে।

সুব্রতর চোখদুটো হঠাৎ যেন জ্বল জ্বল করতে থাকে। সে একটা হাত দিয়ে পূর্বা ভাদুড়ীকে কাছে টেনে আনে।

হঠাৎ তার মুখ চোখের দিকে তাকিয়ে পূর্বা ভাদুড়ী শিউরে ওঠে। কি রকম যেন অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে তাকে। সে এক ঝটকায় সুব্রতর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চায়, কিন্তু পারে না।

সুব্রতবাবু, আমাকে ছাড়ুন, আমার লাগছে। মিস্ ভাদুড়ী কঁকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন। আপনি এরকম অস্বাভাবিক ব্যবহার করছেন কেন? আপনাকে এত বিসদৃশ্য তো এর আগে কখনও দেখিনি?

আমি জানি না। আমাকে করতেই হবে। নেশাগ্রস্তের মত সুব্রত বলে।

একি! আপনার হাতে গ্লাভস্ কেন?···সুব্রতবাবু? আপনিই কি তাহলে?···

মিস্ ভাদুড়ী কথা শেষ করতে পারেন না। সুব্রতর ব্রজমুষ্টি তার কণ্ঠনালীর ওপর চেপে বসতে থাকে।

সুব্রতবাবু!···দোহাই আপনার···আমাকে ছেড়ে দিন···আমি কখনও আর আপনার ধারে কাছে আসব না। আপনার এসব কথাগুলো আমি কাউকে বলব না। দোহাই আপনার, দয়া করে আমাকে প্রাণে মারবেন না।···আমি তো কোন ক্ষতি করিনি আপনার। আপনি কি জন্য আমাকে মারতে চাইছেন?

তা···তো···আমি জানি না···নিশিতে পাওয়া মানুষের মত সুব্রত অস্ফুট স্বরে বলতে থাকে।···

এমন সময় দপ্ করে একটা জোরালো ফ্লাশলাইট জ্বলে ওঠে। ক্যামেরার ক্লিক শব্দ হয়। চিরন্তন, অসীম আর মি. বসু কখন যে পেছনকার ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দিয়ে ব্যালকনি বেয়ে সেই ফ্ল্যাটে এসে লুকিয়ে ছিল, তা কেউ জানতে পারে নি।

ফ্ল্যাশের আলো জ্বলে উঠতেই সুব্রত হতচেতন হয়ে পড়ে যায়। ভাদুড়ী বিকারগ্রস্ত রুগীর মত চেঁচাতে থাকে।

আপনি একটু স্থির হন মিস্ ভাদুড়ী। আপনি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ, চিরন্তন বলে। তারপর সে আর অসীম পাশের বেসিন থেকে আঁজলা ভরে জল নিয়ে সুব্রতর চোখে মুখে ঝাপটা মারতে থাকে।

কিছুক্ষণবাদে সুব্রত ধড়মড় করে উঠে পড়ে। একি···আমি কোথায়? তোমরা···চিরন্তন, অসীম!···মিস্ ভাদুড়ী আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে আছো কেন?···কি হয়েছে? আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম?

না সুব্রত, তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে।

অজ্ঞান···ঘুম···না, না এসব···কি? সুব্রত বিড়্ বিড়্ করে বলতে থাকে।

পূর্বা ভাদুড়ী ততক্ষণে শান্ত সংযত হয়ে সোফায় বসেছেন। চারিদিকে একটা থম্‌থমে ভাব। যেন ঝড়ের পরের স্তব্ধতা। শুধু চিরন্তন উঠে দাঁড়িয়ে সুব্রতর হাত ধরে বলে ওঠে, সুব্রত, তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল! তুমি এখন বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম কর। আমরা কাল সকালে তোমার সঙ্গে দেখা করব!

সুব্রতর হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে তাকে গাড়িতে তুলে দেয় ওরা।

তারপর তিনজনেই শ্লথ পায়ে আবার এসে সেই ড্রইংরুমে বসে। রাত তখন বারোটা।

নাটকের একটা উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্যের অভিনয় হয়ে গেল যেন। কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারে না। তারপর অসীম একটু থেমে বলে, চিরন্তন, সুব্রতকে এভাবে একলা ছেড়ে দেওয়াটা কি ঠিক হল।

এ পর্যন্ত কোন কিছুই বেঠিক হয়নি অসীম। আমার প্ল্যান মত সবই ঠিক ঠিক হয়েছে।

মি. বসু বললেন, এখন আমাদের করণীয় কি? সুব্রতবাবু পুলিশের লোক হয়ে যে এরকম করবেন এ তো কল্পনার বাইরে। আর ওর এই খুনের পেছনের মোটিভটাই বা কি?

এর পেছনে একটা বিরাট মনস্তাত্বিক পটভূমিকা রয়েছে। সেটা না জানলে এর মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যাবে না।

আমাদের সবই খুলে বলুন, চিরন্তন বাবু। মিসেস্ ভাদুড়ী বলেন।

দেখুন, আমি সাইকোলজির ছাত্র ছিলাম। সাইকোলজি বা মনোবিজ্ঞানের একটা বড় কথা হল, নিজেকে আবিষ্কার করা শক্ত। এই যে পর পর তিনটে নারী-হত্যা হল, সেগুলো সবই করেছে সুব্রত সোম। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে কি জানেন, সুব্রত নিজে কিন্তু জানে না যে সে-ই এসব জঘন্য নারীহত্যা করে বেড়াচ্ছে।

সে আবার কি। তাই কখনও সম্ভব?···উপবিষ্ট শ্রোতারা বিস্ময়ে যেন আর্তনাদ করে ওঠে।

এটা একটা মানসিক রোগ। এর ডাক্তারি নাম হচ্ছে 'ডিজাভ্যু' অবস্থা (**dejaunphenomenon**)। এটা একটা ফরাসী শব্দ। এ এক ধরনের 'এপিলেপসি' যাকে মস্তিষ্ক রোগবিশারদরা 'টেমপোরাল লোব এপিলেপসি' (**Temporal Lobe Epilepsy**) বলে থাকেন। এই স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হলে ব্যক্তির বাহ্যিক জগৎ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকে না। মাঝে মাঝে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন তারা 'অ্যামনেসিক স্টেট' বা স্বপ্নাবস্থায় কাজ কর্ম করে থাকেন। সাধারণ লোক তাকে সেই অবস্থায় দেখলে কিন্তু রোগী বলে বুঝতে পারবে না। যদিও তার অস্বাভাবিক আচরণ, বিসদৃশ্য অবস্থা পরিচিত লোকের বিস্ময়োদ্রেক করে থাকে। এই অবস্থায় যা ঘটে, রোগী মনে করে তা সে স্বপ্নে দেখছে।

সবচেয়ে মর্মান্তিক হচ্ছে, রোগী তার এই অবস্থায় নিজেকে একেবারে ভুলে যায়। অনেক সৎ ও নিরীহ লোক এই ধরনের স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত অবস্থায় এমন সব মারাত্মক ও লজ্জাকর কাজ করে থাকেন, যার জন্য পরে তাকে সারা-জীবন অনুতাপ করতে হয়। মাঝে মাঝে এই অবস্থায় কেউ কেউ অজ্ঞানও হয়ে যান, বা এর পরেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন।

গ্লাসগো ইউনিভার্সিটির বিখ্যাত নিউরোসার্জন ডাঃ ডব্লিউ. বি. জেনেট তার এক লেখায় এই ধরনের রোগীর কথা উল্লেখ করেছেন।

আক্রান্ত রোগীটি একজন লরী ড্রাইভার। সে মাঝে মাঝে তার লরীটি এমন নিষিদ্ধ পাড়া দিয়ে নিয়ে যেত, যেখানে সে জীবনে কোনদিন যেত না। তার স্মৃতিতেও কিন্তু ওই পথ ওই পাড়া সম্বন্ধে কোন রেখা পড়ত না। লোকেও তার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করে নি।

পরে একদিন সে সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে একটা অ্যাকসিডেন্ট বাঁধিয়ে বসে ও তারপর অজ্ঞান হয়ে যায়। জ্ঞান ফিরে এলে তার সব কথা মনে পড়ে যায়। এবং সে তার অজ্ঞান অবস্থার অভিজ্ঞতাগুলো বিবৃত করে। ডাঃ জেনেট তার মস্তিষ্কে একটা টিউমার আবিষ্কার করে সেটা অপারেশান করেন। পরে লোকটি একদম ভাল হয়ে যায়।

মন্ত্রমুগ্ধের মত সবাই এই রহস্যঘন বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক ঘটনাগুলো শুনছিল। এবার মিঃ বসু বলে ওঠেন, সুব্রত বাবুও যে এই ধরনের এক মনোবিকলনে ভুগছেন সেটা কি আপনি আগে থেকেই জানতেন ?

না, আমি আগে এটা মোটেই জানতাম না। সুব্রত আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত। তার মধ্যে এই রোগের লক্ষণ দেখা যায় নি। পরে কোন এক সময়ে সে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সুব্রতর পারিবারিক জীবনের পটভূমিকা এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। তার কাছ থেকে আমরা জেনেছিলাম, তার মা ছোটবেলায় মারা গিয়েছিলেন। সৎমার কাছে সে বরাবর বিরূপ ব্যবহার পেয়ে এসেছে। সারাজীবন সে একলা একলা কাটিয়েছে। তার অবহেলিত অনাদৃত জীবনের মরুতে স্নেহের বারি সে কখনও পায়নি। তার ফলে নারীজাতির উপর একটা তীব্র বিদ্বেষ ও ঘৃণা তার অবচেতন মনে দানা বেঁধে ওঠে। বিশেষ করে যুবতী নারীদের প্রতি তার বিরক্তি ও আক্রোশ ছিল অপরিসীম। সচেতন অবস্থায় সুব্রত অবশ্য সেকথা বুঝতে পারত না। কোনদিন সে আমাদের একথা বলেও নি।

সুব্রতকে তুমি প্রথম কখন সন্দেহ করলে ? অসীম জিজ্ঞাসা করে ।

প্রথম নারীহত্যার পর আমার কাছে সমস্ত জিনিষটা ধোঁয়াটে ছিল । উত্তর শহরতলীর সেই কোয়াটারে রাত্তিরের পাহারারত দারোয়ান আমাকে বলেছিল, সুব্রতকে সেই রাত্তিরে সে কোয়ার্টারে দেখেছিল । তার কথায় অবশ্য আমার তখন সুব্রত সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হয়নি ।

সুব্রত সম্বন্ধে আমার প্রথম সন্দেহ হল হোটেল ঈগলে যখন সে বাথরুমে যাবার নাম করে বেরিয়ে যায় । বাথরুম থেকে সে যখন ফিরে আসে তখন লক্ষ্য করি তার গোঁফ দাড়িটা আলগা হয়ে ঝুলছে ।

উত্তর শহরতলীর ওই কোয়ার্টারে সুব্রতর যাতায়াত ছিল । কাজেই সেই রাত্তিরে সুব্রতকে সেখানে দেখতে পাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয় । দারোয়ানের দেখতে ভুলও হতে পারে । তাই তখন আমার কোন সন্দেহ হয়নি ; কিন্তু হোটেল ঈগলে মিস্ লোভেস্তির হত্যার সময়, আর সুব্রতর এই বাইরে বেরিয়ে যাবার সময়ের মধ্যে এত মিল ছিল যে সন্দেহ না করে আমার উপায় ছিল না । হীরা সিং সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ পড়ায় সন্দেহটা আমার আরও দৃঢ় হয় । তাছাড়া সুব্রত ইভনিং ইন প্যারিস সেন্টটা ব্যবহার করত । সেই শিশিটা আমি তার ঘর থেকে চুরি করে এনেছিলাম । আর মৃতা তিনটি নারীর পরিচ্ছদ থেকে সেই সেন্টের গন্ধ পাওয়া গেছে !

মৃতা মিস্ লোভেস্তির মুঠো থেকে আমি কতকগুলো কালো চুল পেয়েছিলাম, সেই চুলগুলো সুব্রত যে পরচুলা পরেছিল তার সঙ্গে মিলে যায় ; কিন্তু তখনও আমি বুঝতে পারিনি সুব্রতর মোটিভটা কি ? আর কেনই বা সে জেনে শুনেও এইভাবে নিজের সুনাম ও চরিত্র হনন করতে যাবে ? কামনার তাড়নায় অস্থির হওয়ার ছেলে তো সে নয় ।

তখন আমি ভাবতে থাকি সুব্রত তাহলে কোন মানসিক রোগে ভুগছে । আমি সেই অনুমান থেকেই তোমাদের বলেছিলাম যে এই ধরনের নারীহত্যা আবার হবে এবং আজ রাত্তিরে মিস ভাদুড়ীকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করে হাতে নাতে আমার ধারণাটাকে প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম ।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমি তাতে সফল হয়েছি । ফ্লাশগানের তীব্র আলোর আঘাতে সুব্রতর 'অ্যামন্যাসিক্ স্টেজটা' কেটে যায় এবং ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় ।

সুব্রতবাবুকে নিয়ে তাহলে আপনারা কি করবেন ? মিস্ ভাদুড়ী শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন।

সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে ট্র্যাজিক প্রশ্ন। চিরন্তন জবাব দেয়।

সুব্রতকে এইভাবে ছেড়ে দেওয়াটা কি ঠিক উচিত হল ? অসীম প্রশ্ন করে।

চিরন্তন কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঘরের ফোনটা ঝনঝন করে বেজে ওঠায় সে থেমে যায়।

পূর্বা ভাদুড়ী ফোনটা ধরেন। ওপাশ থেকে সুব্রতর স্তিমিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়, হ্যালো ! আমি সুব্রত সোম কথা বলছি। চিরন্তনের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

চিরন্তন উঠে এসে ফোনটা ধরতেই সুব্রত বলে, ভাই চিরন্তন, তোমরা দয়া করে এক্ষুণি আমার বাড়িতে সোজা চলে এস। কয়েকটা দরকারী কথা আছে। বলেই সে লাইনটা কেটে দেয়।

সকলেই তাড়াতাড়ি করে নীচে নেমে আসে। একটা ট্যাক্সি ডেকে তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই সুব্রতর ফ্ল্যাটে এসে হাজির হয়। কলিং বেল টিপতেই সুব্রতর চাকরটা হাঁউমাউ করে ছুটে এসে বলল, দুমিনিট আগে বাবুর ঘরে একটা পটকা ফেটেছে। বাবুর ঘরটা ভেতর থেকে বন্ধ। সে কি করবে বুঝতে পারছে না।

সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তন ছুটে গিয়ে দরজায় ধাক্কা মারে। সকলের সম্মিলিত ধাক্কায় দরজার খিল ভেঙে যায়।

কয়েক মুহূর্ত সকলে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘরের ভেতর সে এক ভয়াবহ দৃশ্য। বিছানার সামনে একটা টেবিল। সেই টেবিলের ওপর মাথা রেখে সুব্রত নেতিয়ে পড়েছে। বিছানায় বসে সে কিছু করছিল মনে হয়। ঘরে রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে। সুব্রতর মুখটা যেন একেবারে থেতলে গেছে। তার জামা কাপড় বিছানা রক্তে ভরে গেছে। টেবিলের ওপর রাখা একটা টেপ-রেকর্ডার শুধু ঘুরে চলেছে। পাশের দেওয়ালের সুইচবোর্ডের সঙ্গে সেটার প্লাগ সংযোজিত রয়েছে। চিরন্তন এগিয়ে টেপটা থামিয়ে প্লে-ব্যাকে সুইচটা টিপ দেয়। টেপরেকর্ডটা বেজে ওঠে। তার ভেতর থেকে ভেসে আসে সুব্রতর কণ্ঠস্বর।

···ভাই চিরন্তন, আমরা ফোন পেয়ে তোমরা যখন এই ঘরে এসে পেঁছাবে তখন আমি এই মায়াময় পৃথিবীর সংস্পর্শ কাটিয়ে অন্যলোকে যাত্রা করেছি।

চৌবাচ্চা ভর্তি ঘোলা জলের ভেতরে তাকিয়ে কিছু দেখতে পাওয়া যায় না; কিন্তু সেই ঘোলাজলের বালিমাটি যখন থিতিয়ে নীচে পড়ে, তখন সেই স্বচ্ছ জলে সবকিছু পরিষ্কার দেখা যায়। আমার স্মৃতির চৌবাচ্চার জলটাও এতদিন সেরকম ঘোলা ছিল, সেজন্য আমি কিছু দেখতে পাইনি। বুঝতে পারিনি। আজ সে জলের বালি কাদাগুলো নীচে পড়ে যাওয়ায় আমি পেছনের দিনগুলো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

টেপ রেকর্ডকে পেছনের দিকে টেনে দিলে যেমন আগেকার সংলাপগুলো শোনা যায়, ঠিক সেরকম আমি পেছনকার অতীত দিনের টুকরো টুকরো সংলাপ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি।

সব কথাই আমি বলব। মরবার আগে আমি সবই স্বীকার করে যেতে চাই। ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের পুলিশ অফিসার সুব্রত সোম, আমি আজ স্বীকার করছি, শহরে পরপর তিনটে নারীহত্যা আমিই করেছি। মিস্ ভাদুড়ীকে আমি মারতে গিয়েছিলাম।

উত্তর শহরতলীর কোয়ার্টারে প্রথম আমি মিস্ ধ্রুবা দাশকে রেশমের ফিতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করি। তারপর হোটেল ঈগলে মিস্ লোভেগুর মুখে ও গলায় রুমাল চাপা দিয়ে আমিই হত্যা করি। এবং সব শেষে সাদার্ন এভিনুতে মিস্ বসাককে তার শাড়ির ফাঁস দিয়ে লেকের ধারে খুন করে আমিই গাড়ি করে লেকভিউ রোডের মোড়ে ফেলে দিয়ে আসি। তারপর আজ রাত্তিরে মিস পুর্বা ভাদুড়ীকে···সে কথা তোমরা জান।

···কিন্তু কেন আমি এই সব জঘন্য বর্বরোচিত নারী হত্যা করেছি? সত্যি কথা বলতে কি আমি নিজেই তা জানি না। আমি সুব্রত সোম অত্যন্ত অসুখী নিরানন্দময় এক জীবনযাপন করেছি। বাইরে হাসি, অন্তরে দহন এই নিয়ে আমি জীবনের বোঝা বয়ে চলেছিলাম।

···আমি কিন্তু জ্ঞানত কাউকে খুন বা অপরাধ করিনি। আমি নিজে পুলিশের আইন পড়েছি। আমি জানি কোর্টে হয়তো বিচারক আমায় কোন শাস্তি দেবেন না···কিন্তু আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারলাম না। আমি আজ নিজেকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছি। আত্মঘৃণা, আত্মগ্লানিতে আমার সারা

দেহমন সঙ্কুচিত হয়ে গেছে।···আমাকে তোমরা ক্ষমা কর।·····হে পৃথিবী বিদায়···।

এরপর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। তারপর একটা গুড়ুম করে পিস্তলের শব্দ। তার সঙ্গে সুব্রতর কাতরোক্তি ভেসে আসে; রেকর্ডটা ঘুরে চলে। চিরন্তন গিয়ে সুইচটা অফ করে দেয়।

মিঃ বসু তার মাথা থেকে হ্যাটটা নামিয়ে ফেলে নতজানু হয়ে সুব্রতর দেহের কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে বলেন, আমরা আজ একজন মহৎ, কর্মঠ, তীক্ষ্ণধী পুলিশ অফিসারকে হারালাম। এ ক্ষতি অপূরণীয়।

জয়াজয় (বিজ্ঞানোপন্যাস)

ডাঃ অরুণকুমার দত্ত

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন গাঢ় হয়ে এসেছে। পশ্চিমের সূর্য্য হেলে পড়েছিল। অস্তসূর্য্যের শেষ রশ্মি দেবদারু গাছের চূড়োয় লাল ছোপ ধরাতে ব্যস্ত। খালটার জলে সূর্য্যের শেষ আলো ঝিকমিক করছিল। খালের জলের ওপর ভাসা স্তূপীকৃত কচুরিপানার ওপর দুটো কোঁচ বক চিঁড়িক্ করে উড়ে উড়ে খাবার খুঁজছিল। খালের ধারেই প্রশস্ত মেডিকেল কলেজের গেট। ঢালু মসৃণ রাস্তা দিয়ে একটা মনোরম ফুরফুরে হাওয়া ঘুরে ফিরে বয়ে যাচ্ছে। মেডিকেল কলেজের ভেতরে ঢালু রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানকার তিনতলা কলেজ বিল্ডিং-এ আলো জ্বলছিল।

দোতলার প্রশস্ত হল ঘরটা সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। আজ ফ্রেসারস সোশ্যাল। মেডিকেল কলেজের প্রথম বার্ষিক ছাত্রদের বরণ করে নেবার এটাই ঐতিহ্যবাহি রীতি। ডায়াসের ওপর দ্যুতিময় আলোগুলো জ্বলছিল। নানা-রকমের বেলুনগুলো ফ্যানের হাওয়ায় দুলছিল। ডায়াসের সামনের চেয়ারে অভ্যাগতদের ভীড়। তাদের বেশীরভাগই মেডিকেল কলেজের ছাত্র ও শিক্ষক।

প্রণব মুখাজী ডাক্তারী পড়তে সবে ঢুকেছে। আজ একমাস হলো বর্ধমান থেকে কলকাতার এই হস্টেলে থাকার জায়গা পেয়েছে। কলকাতা শহরের চাল চলন এখনও সে রপ্ত করে উঠতে পারে নি। ভীত ও সঙ্কুচিত দৃষ্টিতে প্রণব দেখছিল, ডায়াসের ওপরে মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন ফোর্থইয়ারের ছাত্র তাপস দাসগুপ্ত।

তাদের স্টুডেন্টস ইউনিয়নের বর্তমান সেক্রেটারি তাপসের আহ্বানে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ক্লাশ রিপ্রেসেন্টটেটিভ নিমাই সেন ডায়াসের দিকে এগিয়ে এল। তার ভাষণ থেকে ফ্রেসারস সোশ্যাল শুরু হবে। নিমাই মাথা চুলকাতে লাগল। এর জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। স্টেজে উঠে বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যেস তার নেই। আশপাশের সিনিয়ারদাদাদের সে জিজ্ঞেস করল কি বলবে। তারপরে সাহস করে স্টেজে দাঁড়িয়ে ইংরেজীতে সকলকে উদ্দেশ্য করার পরেই, একটা ফোলান বড় আকারের বেলুন হঠাৎ দুম্ করে ফেটে গেল। নিমাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে স্টেজ থেকে নেমে পড়ল। সকলে হাসতে লাগল। তারপর আনন্দানুষ্ঠান শুরু হল। গান, মাউথঅর্গান, কেরিকেচার, আবৃত্তির পর উপস্থিত দর্শকদের কিছু বক্তব্য থাকলে বলতে অনুরোধ করা হল। মঞ্চে

উঠে এলেন একজন প্রবীণ নিউরো-সার্জারীর অধ্যাপক। তিনি বললেন প্রথম যৌবনে, হর্মোনের স্রোতের প্রভাবে রামধনু রঙা পৃথিবীর যে ছবিটা ভেসে ওঠে, জীবনের সায়াহ্নে এসে তার চোখের সামনে সেই ছবি মুছে গেছে। তবুও আজকের ফ্রেসার্স স্যোসাল দেখে মেডিকেল কলেজের তাঁর ছাত্রাবস্থার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

এরপরে ছিপছিপে সুন্দর চেহারার যে চিকিৎসক উঠে এলেন, তাকে দেখে প্রণবের চোখের পলক পড়ছিল না। গ্রীক ভাস্কর্যের মূর্ত্তির মতন চেহারা, টিকালো নাক, প্রতিভাদীপ্ত প্রশস্ত কপাল, ব্যক্তিত্বপূর্ণ শাণিত চেহারা। বয়সে তার থেকে প্রায় বছর দশেকের বড় হবে। এ্যানাটমির ডেমনস্ট্রেটার ডাঃ কুশল কুশারি। নিউরো সার্জারীর বৃদ্ধ অধ্যাপকের ভাষণের জের টেনে ডাঃ কুশারি বলে চললেন আমার শিক্ষক অধ্যাপক ডাঃ মিত্র যে হর্মোনের কথা বললেন, তারই সূত্র ধরে আমি বলতে চাই, আজকের ফ্রেসারস স্যোসাল প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের কাছে যতটা মূল্যবান, আমাদের কাছে ততটা নয়। এই প্রথম দিনের বেলুন ফাটার কথা, তাদের ক্লাশ রিপ্রেসেন্টেটিভ-এর অসমাপ্ত ভাষণের ঘটনা, তাদের স্মৃতির মণিকোঠায় চিরদিনের জন্য ভাস্বর হয়ে থাকবে। এই স্মৃতি-টাই সব থেকে বড় কথা। হর্মোনের জোয়ারে মানুষের শরীরে যে উদ্দিপনা আসে সেই উত্তেজনা যৌবনের শেষে স্তিমিত হয়ে যায়। কিন্তু কেন?···এই হর্মোনের স্রোতকেই যদি আমরা চালু রাখতে পারি শরীরের হর্মোণগ্রন্থিগুলো যদি আমরা স্থায়ীভাবে সক্রিয় রাখতে পারি, তাহলে আমাদের যৌবনও আমরা চির-কালের জন্য ধরে রাখতে পারব। আমাদের প্রবীন শিক্ষক ডাঃ বীরেশ্বর মিত্র যিনি যৌবনের হারিয়ে যাওয়া রামধনু রঙা দিনগুলোর কথা ভেবে আক্ষেপ করেছেন, তখন তাঁর সে ক্ষোভও আর থাকবে না।

প্রণব একাগ্রচিত্তে ডাঃ কুশারির কথাগুলো যেন গিলছিল। তার চোখের সামনে এক নতুন জগতের দরজা খুলে যাচ্ছে। কুশল কুশারি তাকে যেন আকর্ষণ করছে। তাকে যেন হাতছানি দিয়ে সেই বিজ্ঞানের দরজার ভেতরে ঢোকার আহ্বান জানাচ্ছে।

এ্যানাটমি হলের টেবিলের ওপর সারি সারি মড়া শোয়ানো ছিল। প্রথম বার্ষিক ছাত্ররা মরা কাটছে। আর ভেতরকার মাংসপেশী, শিরা, ধমনী, স্নায়ু পর পর কি রকম ভাবে সাজানো রয়েছে সেই এ্যানাটমি বিদ্যা শিখছে। পাঁচটা বাজতে এ্যানাটমির দরজা বন্ধ হয়ে গেল! সব ছাত্ররা যখন একে একে চলে যাচ্ছে, তখন প্রণব লক্ষ্য করল ডঃ কুশারি দোতলার ব্যালকনি থেকে অন্য একটা

ঘরে যাচ্ছেন। কৌতূহলী হয়ে প্রণব পায়ে পায়ে ডাঃ কুশারিকে অনুসরণ করে, ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে পোস্টমর্টেম রুমের পাশে রিসার্চ রুমে এসে হাজির হল।

অবাক হয়ে প্রণব দেখে টেবিলের ওপর শোয়ান একটা মৃত কুকুরের মাথা কেটে মস্তিষ্কটাকে খুলে ফরসেপ দিয়ে তিনি কি যেন তুলে ধরে দেখছেন। প্রণবের পায়ের শব্দ শুনে কুশল কুশারি কে! বলে পেছন ফিরে তাকায়। প্রণবের আসার উদ্দেশ্য জেনে ও আগ্রহ দেখে, কুশল খুশি হয়ে বলেন, দেখ মস্তিষ্কের তলদেশে সুপুরীর মত এই যে পিটিউটারি গ্ল্যান্ড দেখছ, এই হচ্ছে অন্তক্ষরা গ্রন্থিদের দলপতি। তোমার এখন ফার্স্ট ইয়ার। ডাক্তারির অ, আ, ক, খ, এখন শেখনি। তাই সংক্ষেপে সহজ করে বলি মানুষের শরীরে কতকগুলো অন্তক্ষরাগ্রন্থি আছে, যৌবনের শুরুতে সেই গ্রন্থিগুলো থেকে হর্মোণ নামে এক ধরনের রস বেরিয়ে আসে। এই হর্মোণের প্রভাবে, কিশোর যুবকে ও কিশোরী যুবতীতে রূপান্তরিত হয়। আবার যৌবন শেষে এই গ্রন্থিগুলো যখন শুকিয়ে যায় তখন তাদের রসক্ষরণও স্তিমিত হয়ে পড়ে। তাই বার্ধক্য এগিয়ে আসে। এই অন্তক্ষরা গ্রন্থিগুলোকে যদি একটা ব্যান্ড পার্টি হিসাবে কল্পনা করা যায় তাহলে মস্তিষ্কের পিটিউটারিকে বলতে হয় ব্যান্ড মাস্টার। পিটিউটারির প্রথম তার বিউগলে সুর তোলে। সেই সুরের ঝংকারে অনুপ্রাণিত হয়ে শরীরের অন্যান্য অন্তক্ষরাগ্রন্থিগুলো সম্মিলিত অর্কেস্টার ধ্বনি তোলে। এই পিটিউটারিকে যদি কোন ভাবে সঞ্জীবিত রাখা যায় তাহলে তার হর্মোণের প্রভাবে বাকী অন্তক্ষরা গ্রন্থিগুলো সজীব ও সক্রিয় থাকবে। এই যৌবন অটুট রাখার জন্য আমি কুকুরের ওপর এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যাচ্ছি। প্রণব ফস্ করে বলে বসল, আচ্ছা মানুষ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা যায় না? মুহূর্তের জন্য কুশলের চোখ দপ্ করে জ্বলে উঠল, উত্তেজিত কণ্ঠে সে বললে,—কি বললে মানুষ!...

—তোমার সাহস আছে দেখছি তারপর পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে প্রণবের হাতে দিয়ে কুশল বলেন, সামনের শনিবার সন্ধ্যের পর তুমি আমার বাড়িতে এসো, তোমাকে আমি এ্যানাটমি শেখাবো।

শনিবার তপসিয়া রেললাইন পেরিয়ে যখন প্রণব কুশলের বাড়িতে পেঁছাল তখন সন্ধ্যা নেমে গেছে। কাছের কবরখানা থেকে শববাহকদের মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। একটা বাগান বাড়ি। বাড়িটা জীর্ণ হলেও, এককালে বনেদী ছিল তা মেঝের মার্বেল দেখে বোঝা যায়।

কলিংবেল টিপতেই হাসিমুখে কুশল এগিয়ে এসে তাকে ভিতরে

নিয়ে গেলেন। অকৃতদার ডাঃ কুশারি খুব মেধাবী ছাত্র। প্রণব আগেই জেনেছে; কিন্তু পুরো বাড়িতে কুশল একলা থাকে ভেবে প্রণব একটু অবাক হল। তার মনের কথা বুঝতে পেরে বলেন, দেখ চিকিৎসাবিদ্যা যদি শিখতে চাও তাহলে এই বিজ্ঞানকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতে হবে। নোট মুখস্থ করে পাশ করলে চলবে না। আমি টাকা রোজগার করার জন্য, শুধু চিকিৎসা করার জন্য চিকিৎসাবিদ্যা শিখিনি। আমি এখন কিছু আবিষ্কার করতে চাই। যাতে সমগ্র মানবসমাজ উপকৃত হতে পারে।

এমন সময় পেছনের দরজায় একটা করাঘাতের শব্দ শোনা গেল। কুশল দ্রুত পায়ে বাগানের দিকের দরজাটা খুলে দেয়। বিস্ময় বিস্ফোরিত চোখে প্রণব দেখে ডোমের মতো দেখতে দুটো কালো লোক একটা সদ্য মৃতদেহকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এসেছে। দরজাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে কুশল। একটা চোরাকুঠরির বোতাম টেপেন। দেয়াল ফাঁক হয়ে একটা ঘর বেরিয়ে পড়ে।

ঘরের ভেতর মড়াটাকে ঢুকিয়ে, কুশল ডোম দুটোর হাতে এক তাড়া মোট গুঁজে দেয়।

ডোমদের বিদায় করে প্রণবকে চোরকুঠরির ভেতর এনে কুশল বোতাম টিপে দেওয়ালটা বন্ধ করে দেন। ঘরটা স্যাঁৎ সেঁতে। ওপরে দুটো ঘুলঘুলি দিয়ে বাগানের গাছগুলো দেখা যায়। প্রণবের আতঙ্কিত, হতচকিত মুখের দিকে তাকিয়ে কুশল বলেন, সব খুলে বলা দরকার, কারণ তোমার মতো একজন উৎসাহী ছাত্রের সাহায্য আমার খুব প্রয়োজন। তোমাকে আমি নিজের হাতে এ্যানাটমি ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি শেখাব। প্রণব ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বলে, এই টেবিলের ওপর সদ্য মৃত যুবকটাকে কোথেকে আনলেন?

—তোমার কি মনে হয়? প্রণবের চোখে চোখ রেখে কুশল প্রশ্ন করে। একটু দ্বিধা করে প্রণব বলে, মনে হচ্ছে কবরখানায় এক্ষুনি যে মড়াটাকে গোর দিল, তাকেই তুলে আনা হয়েছে।—ঠিক তাই। শান্ত অবিচলিত কণ্ঠে কুশল বলেন।

এরপর কুশল বলে চলেন কবরখানার লোকেদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ রয়েছে। তারা আমাকে নিয়মিত মড়া সরবরাহ করে। ঐ সদ্য মৃতদেহ নিয়ে আমি পরীক্ষা চালাই,—কিন্তু এটা তো অন্যায় কুশলদা। এটা বেআইনী ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে না? প্রণবকে থামিয়ে দিয়ে কুশল বলে, দেখ মানুষের আইনের ওপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সোপান তৈরী হয়েছে। কত বিজ্ঞানী নিজের জীবন দিয়ে বিজ্ঞানের উন্নতি করে গেছেন তা জান? সাধারণ মানুষ

বিজ্ঞানও প্রযুক্তির এই উন্নতির ফল ভোগ করছেন। জড় ও জীবনের সীমা-রেখাটা কোথায় তাই নিয়ে বিজ্ঞানীদের কৌতূহলের অন্ত নেই। যে মানুষটা এই মাত্র মরে গেল, তার শারীরিক মৃত্যু কিন্তু তখনই হয় না। সঙ্গে সঙ্গে হার্ট ম্যাসেজ করে তাকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব। কুশলের কথা শেষ হবার আগেই ওপর থেকে ঘন ঘন কলিং বেল বাজানোর শব্দ এল। প্রণবকে নীচে রেখে কুশল সিঁড়ি দিয়ে একাই ওপরে উঠে এল।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে কুশল নীচে ফিরে এসে বললেন, স্থানীয় পুলিশের দল গোরস্থান থেকে মড়া চুরি যাওয়ার ব্যাপারে আমি কিছু জানি কিনা জিজ্ঞেস করতে এসেছিল। তাদের কিছু জানিনা বলে আমি চলে এলাম। দেখ প্রণব, মানুষ কেন বৃদ্ধ হয়? এই জরার আক্রমণ থেকে কি মানবদেহকে রক্ষা করা যায় না? ভগবান বুদ্ধদেব থেকে আরম্ভ করে অনেক বিজ্ঞানী এই নিয়ে অনেক চিন্তা ও গবেষণা করে আসছেন। তাদের সঙ্গে আমি নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি। পাকিস্তানের কাশ্মীরে হুনজা বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে ৯০থেকে ১০০ বছর বয়স পর্যন্ত বৃদ্ধরা নিয়মিত ভলিবল খেলে, পাহাড়ে ওঠানামা করে। কচ্ছপ, কাকাতুয়ার মত প্রাণীরা বহু বছর বাঁচে। বট, অশ্বত্থ প্রায় তিনশো বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান দেখিয়েছে, জিনের প্রভাবেই এটা হয়ে থাকে। এই জিন মানুষের শরীরের কোষের ভেতর থাকে। বংশের প্রভাবের ধারা এরাই বয়ে নিয়ে চলে। এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে এখন অনেক জায়গায় গবেষণা চলছে।

এরপরে ছুরি ও ফরসেপ ধরে টেবিলে শায়িত যুবকটার মৃত দেহ লম্বালম্বি ভাবে কুশল কেটে ফেলেন। তারপর বলেন দুর্ঘটনার ফলে এর পেটে এ্যাওটা ধমনী ছিঁড়ে যাওয়াতে মৃত্যু হয়েছে। তারপর তার করোটি খুলে সুপুরীর মত ছোট্ট পিটিউটারি গ্ল্যান্ডটা ফরসেপ দিয়ে তুলে এনে একটা ছোট্ট কাঁচের বাক্সের ভেতর কুশল রেখে দেয়। আর মস্তিষ্কটাকে একটা এ্যাসিডের জারের মধ্যে চুবিয়ে দেয়। তারপর হেসে বলেন, এর হাড়গুলোর সাহায্য নিয়ে ডাক্তারি ছাত্ররা পড়াশুনো করতে পারবে। চোখের কর্ণিয়া থেকে কিডনী সব কিছুই আমি সযত্নে রেখে দিই যাতে ভবিষ্যতে মানুষের প্রয়োজনে এই অঙ্গগুলো সংযোজন করা যায়।

প্রণবের গা ঘেন্নায় রি রি করছিল, কিরকম বমি বমি ভাব আসছিল। সেটা চেপে প্রণব বলল, কুশলদা আপনি কিন্তু খুব গর্হিত কাজ করছেন।

—গর্হিত কাজ। কুশলের কপালে কুঞ্চন দেখা দেয়। তারপর একটু থেমে বলে, তাহলে শোন, এই এ্যানাটমি বিদ্যার খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ করে, চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন জন হাণ্টার প্রায় তিনশো বছর আগে। তখন বিলেতে মড়া দুষ্প্রাপ্য ছিল। তিনি কবরখানা থেকে মড়া সংগ্রহ করতেন। প্রয়োজন হলে তার সাকরেদরা নির্জন রাস্তায় চলমান পথিকের মাথায় ডাণ্ডা মেরে তাঁর নিজস্ব শবব্যবচ্ছেদ ঘরে নিয়ে আসত। সেখানে তিনি শবব্যবচ্ছেদ করে মাংসপেশী, স্নায়ু, ধমনী, শিরা-উপশিরার অবস্থান ও বিন্যাস পর্যবেক্ষণ করে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর জন্যেই আমরা আজ এ্যানাটমি শিখতে পারছি।

একটু থেমে কুশল আবার বলতে শুরু করে, ডাঃ হাণ্টারের কাছে অপারেশন করা খুব নীচু কাজ ছিল। নাপিতেরাই তখন ছোটখাট ফোঁড়া ইত্যাদি কাটত। সেজন্য সার্জেনদের তখন পরিহাস করে বারবারস্ বলা হত। তাই এফ. আর সি. এস পাশ করা সার্জেনরা আজও নিজেদের নামের আগে ডাক্তার না লিখে মিষ্টার লেখেন। প্রণব চুপকরে ভাবছিল। তার ভাবান্তর দেখে কুশল বলে তোমাকে আমি এ্যানাটমি সার্জারী শেখাব। কিন্তু তোমাকে আমার কাজে সাহায্য করতে হবে। প্রণব শান্তভাবে বলল, এই কাজগুলোর বৈজ্ঞানিক দিকের কথাই আপনি ভাবছেন, কিন্তু মানবিক ও নৈতিক দিকটা দেখছেন না। যাদের আত্মীয়ের মড়া চুরি যাচ্ছে তারা এটা কি ভাবে নেবে, আর আইনের চোখেও তো আপনি অপরাধী হয়ে যাচ্ছেন।

প্রণবের কথাগুলো শুনে, কুশলের সারা মুখে এক পলকের জন্যে যেন বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। কুশল উত্তেজিত কণ্ঠে বলে চললেন—যে কোন বড় কাজ করতে গেলেই বিজ্ঞানীদের অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হয়। মানব সমাজের সম্পদের মূলে বৈজ্ঞানিকদের যে বিরাট অবদান আছে। তার কথা ভুল না। নিজেদের জীবন বিপন্ন করে তাঁরা সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন। জান, ডাঃ হাণ্টারের ধারণ ছিল সিফিলিস কখনও মানুষের হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করে না। সেটা প্রমাণ করার জন্য তিনি নিজের শরীরে সিফিলিসের

জীবাণু ঢুকিয়ে ছিলেন। পরিণামে তাঁর সারা শরীরে, শেষ পর্যন্ত হৃৎপিণ্ডেও সিফিলিস ছোবল বসিয়েছিল। তখন সিফিলিসের ঠিকমত চিকিৎসা ছিল না। পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হয় নি। হৃৎপিণ্ডের অসুখে জর্জরিত হয়ে, এ্যানজাইনার ব্যথায় কাতর হয়েও ডাঃ হাণ্টার আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন। তাঁর মুখের অভিব্যক্তি, উপসর্গাদি লক্ষ্য করতেন। তারপর সেগুলোর বিবরণ খাতায় লিপিবদ্ধ করতেন। ডাঃ হাণ্টার শেষ পর্যন্ত মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু সিফিলিসও যে হৃৎপিণ্ডকে আক্রমণ করে তা নিজের জীবন দিয়ে তিনি প্রমাণ করে গেছেন।

এরপর থেকে প্রণব কুশলের পার্ক সার্কাসের নির্জন বাগান বাড়ীতে নিয়মিত আসা যাওয়া করতে লাগল। কুশলের সবযুক্তি, তর্ক সে মেনে না নিতে পারলেও চিকিৎসাবিদ্যা শেখার অদম্য আগ্রহে সে কুশলের কাছে আসত। কুশল তাকে দারুণভাবে আকর্ষণ করত। সমস্ত জীবন, তার সমস্ত উপার্জন কুশল এক্সপেরিমেণ্টের পেছনে খরচ করতেন। সে বাড়িতে মালি ও একটা রান্নার লোক ছাড়া আর কেউ থাকত না।

প্রণব সে বছর এ্যানাটমির প্রসেক্টর হল। ক্লাশে সব থেকে ভাল ছাত্রই এই সম্মান পেত। প্রাথমিক এম. বি. বি. এস. পরীক্ষায় এ্যানাটমিতে অনার্স নিয়ে প্রণব পাশ করল।

একদিন সন্ধ্যায় পার্ক সার্কাসের বাড়ীর বাগানের ভেতর একটা কদম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে প্রণব ও কুশল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। মাথার ওপর কাস্তে চাঁদের আলো। চারিদিকে একটা বন জ্যোৎস্নার আভাস। কুশল বলছিলেন জরাকে যদি আমরা কোনভাবে করায়ত্ব করতে পারি, তাহলেমানুষের জীবন অনেক সুন্দর, অনেক আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

যদিও মানুষ কোনদিনও অমর হবে না। কিন্তু তার চির যৌবন থাকবে। পুরানে রাজা যযাতির উল্লেখ আছে। যযাতি অনন্ত যৌবন ভোগ করতে চেয়ে ছিলেন। জরার আক্রমণে ক্লিষ্ট যযাতি তার ছেলে পুরুর যৌবন গ্রহণ করে নিজের বার্ধক্য তাকে দিয়ে দিলেন। বহু বছর যৌবন ভোগ করে তিনি পুরুকে আবার তার যৌবন ফিরিয়ে দিয়ে বার্ধক্য বরণ করে নেন। আমার মনে হয়, পৌরাণিক কাহিনীর সব কিছু কবি কল্পনা নয়। যযাতি কোন উপায়ে তার ছেলে পুরুর সঙ্গে নিজের পিটিউটারি গ্ল্যাণ্ড বদলে সংযোজন করেছিলেন।

এভাবে যুবক যুবতীর পিটিউটারি গ্ল্যাণ্ড যদি বৃদ্ধের মস্তিষ্কে সংযোজন করা যায়, তাহলে তার যৌবন অটুট রাখা সম্ভব। এই অনন্ত-যৌবন মানুষের আজ খুবই দরকার। মহাকাশ যুগ শুরু হয়েছে, একটা গ্রহ থেকে আর একটা গ্রহে যেতেই মানুষের কর্মজীবন ফুরিয়ে যায়।

এমন সময় বাগানের আলো আঁধারির ভেতর একটা দ্রুত পদ শব্দ শোনা গেল। একটা ছায়ামূর্ত্তি জাম গাছটার তলা থেকে দৌড়ে তাদের কাছে এল। সবিস্ময়ে ডাঃ কুশারি জিজ্ঞেস করেন, কাল্লু তুমি ?

……হ্যাঁ স্যার। একটা নয়া লাশ পাচার করতে গিয়ে লোকেরা টের পেয়ে যায়। ওরা আগে থেকেই সন্দেহ করছিল। ওৎ পেতে পাহারা দিচ্ছিল। কবর থেকে তোলবার আগেই আমাকে তাড়া করে। আমি ছুটে পাঁচিল টপকে এখানে পালিয়ে এসেছি। ওরা এখানেও খুঁজতে আসবে। আমাকে দয়া করে লুকিয়ে রাখুন।

প্রণবকে কদম গাছের তলায় বেঞ্চিতে বসিয়ে রেখে কুশল কাল্লুকে নিয়ে চলে গেল। একটু পরেই ঘন ঘন কলিং বেল-এর আওয়াজ শুরু হল। অনেকগুলো লোকের পায়ের শব্দ হৈ-চৈ চেঁচামেচি, চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। বাগান, বাড়ীটার পেছনদিকে ছিল। বাগানের চারিদিকে উঁচু দেওয়াল। কাল্লু পাঁচিল টপকে এসেছিল। কদমতলায় পাথরের বেঞ্চিতে বসে, দুরু দুরু বুকে প্রণব শুনতে পায় লোকগুলো চেঁচিয়ে বলছে লোকটাকে আমরা এই দিকেই ছুটে আসতে দেখেছি। মড়া কোথায় পাচার হচ্ছে ? এর একটা বিহিত করা দরকার।

এরপর লোকগুলো হুড়মুড় করে বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়ে। প্রণব শুনতে পায় অকম্পিত স্বরে ডাঃ কুশারি বলছেন,—তাহলে কি আমি মড়াগুলো গায়েব করেছি বলে আপনাদের ধারণা ? আমি চিকিৎসক ; মানুষকে বাঁচান আমার পেশা, মানুষ মারা নয়। ছিঃ ছিঃ ডাক্তার সাব.…আপনি এসব কেন বলছেন। জনতার ভেতর থেকে কথাগুলো ভেসে আসে।

আবার শোনা যায় কেউ বলছে আমরা বাড়ীর ভেতর খুঁজে দেখব। ডাক্তার সাবকে না জানিয়ে হয়ত লোকটা ভেতর কোথাও লুকিয়ে আছে।

—বেশ, আপনাদের সন্দেহ হলে খুঁজে দেখুন। শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে ডাঃ কুশারি বলেন।

লোকগুলো তন্ন তন্ন করে বাড়ীর ভেতর খুঁজতে লাগল। বাড়ীতে কোথাও কিছু না পেয়ে, তারা বাগানে এসে প্রণবকে দেখে থমকে দাঁড়াল। তার পরিচয় জানতে চাইল। ডাঃ কুশারি, প্রণব তাঁর ছাত্র জানিয়ে বললেন—ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন। ও তো আমার কাছে পড়তে প্রায়ই আসে। প্রণব থতমত খেয়ে বলল,—আমরা পড়াশুনা নিয়ে এখানে আলোচনা করি। আপনাদের চেঁচামেচিতে আমি বিস্মিত ও বিব্রত বোধ করছি। আমি এখনই চলে যাব।

হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটায় জামগাছের মাথাটা কেঁপে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা পেঁচা কর্কশভাবে ডেকে ওঠে। আগন্তুকের দল হক-চকিয়ে গেল। মনে হল তারা ভয় পেয়েছে। তাদের মধ্যে একজন ফিসফিস করে বলে উঠল,—এসব, দানোর কারবার নয় তো? ওরাই মরামানুষের ভেতর সুযোগ পেলে ঢুকে যায়। ভিড়টা এবার হাল্কা হয়ে গেল। ডাঃ কুশারির কাছে মাপ চেয়ে লোকগুলো চলে গেল।

এর বেশ কিছুক্ষণ পরে, কুশল কাল্লুকে পাঁচিল ডিঙিয়ে বার করে দিয়ে এসব কারবার এখন বন্ধ করতে নির্দেশ দিল।

প্রণব গুম হয়ে ছিল। সে ধীরে ধীরে বলল, কুশলদা, আমার কিন্তু এ ধরনের ব্যাপার ভাল লাগছে না।

[দুই]

এরপর আরও সাত বছর কেটে গেছে। ডাঃ কুশারি মাষ্টার অব সার্জারী পাশ করে কলকাতায় আর একটা মেডিকেল কলেজে বড় সার্জেন হয়েছেন। দক্ষ ও কুশলী সার্জেন হিসাবে তার নাম তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ডাঃ কুশারি তখনও অকৃতদার। পার্কসার্কাস থেকে তিনি তাঁর বাসা বদলিয়ে টালিগঞ্জের গল্ফক্লাবে চলে এসেছেন।

প্রণব সার্জারীতে অনার্স নিয়ে এম. বি. বি. এস পাশ করেছে। ইনটার্ন ও হাউস সার্জেন শিপ শেষ করে সে ডাঃ কুশারির হাসপাতালেই স্নাতকোত্তর ছাত্র হিসাবে শল্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করছে। ভবিষ্যতে তারও একজন বড় সার্জেন

হওয়ার ইচ্ছে। ডাঃ কুশারির সঙ্গে প্রণবের সম্পর্ক এত দিনে আরও দৃঢ় ও নিবিড় হয়েছে।

ডাঃ কুশল কুশারির দক্ষ ও কুশলী শল্য বিদ হিসাবে এখন দারুণ নাম। তাঁর পসারও প্রচুর। যদিও তিনি সব রোগী দেখেন না। সীমিত সংখ্যার রোগী তিনি দেখে থাকেন। তাঁর ছুরির ও ফরসেপসের যেন যাদু আছে। তাঁর সবরকমের শল্যায়নই সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় সার্জেন হিসাবে তাঁর তখন বিপুল জনপ্রিয়তা। ডাঃ কুশারি কিন্তু তাঁর গবেষণা ছাড়েন নি।

টালিগঞ্জের বাড়ীর ভেতর তিনি তাঁর ল্যাবোরেটরী ও অপারেশন থিয়েটর গড়ে তুলেছেন। যদিও তাঁর নার্সিং হোমটা পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে।

প্রণব মুখার্জী, ডাঃ কুশারির কাছ থেকে হাতে নাতে শেখবার ও শল্যায়নের সময় তাঁকে সাহায্য করার সুযোগ পেয়ে অনেক কিছু শিখে ফেলেছে। বিশেষ করে সার্জারীর বাস্তব দিকগুলো, অপারেশনের টেকনিকগুলো ডাঃ কুশারি অনেক সময় তাঁর নিজস্ব পরিবর্তিত পদ্ধতিতে করায়। ডাঃ কুশারির চিন্তা ধারা ও কর্মপ্রণালীর খুঁটিনাটিগুলো প্রণবও রপ্ত করে নিয়েছিল। এসময় একদিন প্রণব তার পৈত্রিক বাড়ী বর্ধমানের ভাতারে চলে গেল। সেখানেই প্রণবের বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল। বিয়ে করে প্রণব ফিরে এল।

ডাঃ কুশারি একদিন প্রণবকে তাঁর টালিগঞ্জের রিসার্চরুমে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। হাসপাতালের পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে দুজনে কথা বলছেন, আমগাছটার তলায় তাদের কয়েকটা ফটো তোলা হল। কথায় কথায় ডাঃ কুশারি বললেন,—দেখ প্রণব তুমি তো বিয়ে করে সংসারি হয়েছ, কিন্তু আমার রক্তে গবেষণামূলক কাজগুলো করার এক দুরন্ত নেশা সব সময় সক্রিয় রয়েছে। আমি শীগগীর ফেলোশিপ করার জন্য লণ্ডনে যাচ্ছি। সেখান থেকে সুইডেনে হাতে কলমে কাজ শেখার জন্যে যাব। তোমাকে আগে বলেছিলাম, জরা জয় করার পদ্ধতি আবিষ্কার নিয়ে উন্নত দেশগুলোতে প্রচুর গবেষণা ও লেখালেখি চলছে। আমি সেখানে গিয়েও কাজ করব। কিছু কিছু গবেষক অবশ্য জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ওপর বেশী জোর দিচ্ছেন। আমি কিন্তু পিটিউটারি বদলে দিয়ে অন্যান্য আনুষঙ্গিক—হর্মন থেরাপি চালিয়ে প্রাণিদেহের জরাকে

জয় করতে চাই। আজ সন্ধ্যায় আমার টালিগঞ্জের বাড়িতে কুকুরের ওপর অপারেশন করব। তুমি এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য এস।

প্রণব যখন ডাঃ কুশারির গল্ফ ক্লাবের লেবরেটারি সংলগ্ন দোতলায় অপারেশন কক্ষে ঢুকল তখন সন্ধ্যে উতরে গেছে। একটা বুড়ো কুকুর দরজার ধারে বসে হাঁফাচ্ছিল। তার গলায় চেন বাঁধা ছিল।

ডাঃ কুশারির বিশ্বস্ত সহচর রামু এই সময় একটা জোয়ান তেজি কুকুরকে নীচে থেকে হ্যাঁচরাতে হ্যাঁচরাতে নিয়ে এল। তার গলায়ও চেন বাঁধা। যদিও সে খুব চ্যাঁচাচ্ছিল। টেবিলের ওপর দুটো কুকুরকে পাশাপাশি শোয়ান হল। ধমনীর ভেতর দিয়ে ইনজেকসন করে গ্যাস শুঁকিয়ে দুটো কুকুরকে অজ্ঞান করান হল। তারপর চলল একটা দীর্ঘ দুরূহ শল্যায়ন পর্ব। জোয়ান কুকুরটার করোটি খুলে মস্তিষ্কের তলদেশে পেঁাছে নাসার আধারের মতো রাখা জায়গা থেকে পিটিউটারি গ্ল্যান্ডকে কুশলী আর্জেন কুশারি ধীরে ধীরে বার করে আনলেন। তারপর বৃদ্ধ কুকুরটার পিটিউটারি গ্ল্যান্ড সংযোজিত করলেন। মাইক্রো সার্জারীর সাহায্যে ধমনী, শিরা, উপশিরার জালগুলো ধীরে ধীরে সংযোজিত করলেন। তারপর বুড়ো কুকুরটাকে আলাদা জায়গায় রেখে দেওয়া হল। জোয়ান কুকুরটার মৃতদেহ রামু বাইরে পাচার করে দিল।

প্রণব প্রয়োজনে ডাঃ কুশারির নার্সিং হোম বা বাড়ীতেও রাত কাটাত। পরদিন সকালে প্রণব টালিগঞ্জের বাড়ীতে শুয়েছিল। ডাঃ কুশারির ডাকে সে উঠে বুড়ো কুকুরটাকে দেখতে গেল। অবাক কান্ড! কুকুরটার শিথিল মাংসপেশীগুলো টান টান হয়ে উঠেছে। কোঁচকান চামড়া মসৃণ হয়ে গেছে। একটা জোয়ান কুকুরের মত সে চেঁচাচ্ছে। ডাঃ কুশারি গর্বের হাসি হেসে বললেন, অপরেশন ইজ সাকসেস্ ফুল। বুড়ো কুকুরটা এখন যুবকে রূপান্তরিত হয়েছে। এটাই আমার সাফল্যের প্রথম সোপান। কুকুরটার পিঠ চাপড়ে ডাঃ কুশারি বললেন।

প্রণব যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। এওকি সম্ভব, চোখের সামনে দেখা একটা কুকুরের মস্তিষ্কে শল্যায়ন করে ও দেহে ইনজেকসন্ দিয়ে তাকে একটা জোয়ান কুকুরে পরিবর্তিত করে দেওয়া হল। ডাঃ

কুশারির নির্দেশে প্রণব সেই কুকুরটাকে একটা ঘুমের ইনজেকসন্ দিয়ে দিল।

ড্রইংরুমে ফিরে গিয়ে একটা আমেরিকান জার্নালের পাতা উলটিয়ে ডাঃ কুশারি প্রণবের চোখের সামনে মেলে ধরলেন। সেটা একজন সুইডিস্ চিকিৎসা বিজ্ঞানীর লেখা। বিজ্ঞানের প্রয়োজনে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে সূক্ষ্ম প্রযুক্তির সাহায্যে, মানুষের যৌবনকে দীর্ঘায়িত ও পরে পাকাপাকিভাবে চিরস্থায়ী করতে হবে। সংক্রামক রোগ ও দুরূহ ব্যাধি করায়ত্ব করার ফলে সমাজে জরাগ্রস্থ বৃদ্ধের সংখ্যা বাড়ছে। মানুষ দীর্ঘায়ু হচ্ছে, কিন্তু জরাকে জয় করতে না পারার জন্যে অশক্ত, বৃদ্ধদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এদের পুনর্বাসন করা সম্ভব হচ্ছে না। সেজন্য বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং সাহায্যে শল্যায়ন করে মানুষের যৌবনকে চিরস্থায়ী করতে হবে। এই যৌবনের শুরু ও শেষ থাকবে কিন্তু বার্ধক্য আসবে না।

প্রণবের বিস্মিত ভাববিহ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে, ডাঃ কুশারি কফির কাপে চুমুক দিলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, প্রণব তোমাকে আমি বলেছি, আমাদের পুরানে রাজা যযাতি যৌবন ভোগ করার লোভে, তাঁর শরীরের জরা নিজের ছেলে পুরুকে দিয়েছিলেন। বৃদ্ধ রাজার বাধ্য ছেলে পুরু, বাপের বার্ধক্য নিয়ে নিজের যৌবন বাবাকে ভোগ করতে দেয়।

কফির কাপটা শেষ করে টেবিলের ওপর রেখে প্রণব এবার স্মিত হেসে বলে রাজা যযাতি কিন্তু যৌবন ভোগ করে তৃপ্ত হতে পারে নি। শেষকালে তিনি বুঝেছিলেন প্রবৃত্তিতে মুক্তি নেই, নিবৃত্তিতে আছে। তাই পুরুকে আবার নিজের যৌবন ফিরিয়ে দিয়ে তার বার্ধক্য নিজের শরীরে তুলে নিয়ে বনে চলে যান।

ড্যাম ইয়োর নিবৃত্তি। ডাঃ কুশারি টেবিলের ওপর একটা ঘুঁষি মেরে বললেন। কফির কাপগুলো ঝন ঝন করে উঠল। দ্যাখো প্রণব, লাইটারে পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ডাঃ কুশারি বললেন, মোদ্দা কথা হচ্ছে, পৃথিবীটা ভোগের জায়গা, যার ক্ষমতা আছে সেই ভোগ করবে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'ওরে ভীরু তোমার হাতে নেই ভুবনের ভার।' পুরাকালে হর্মনের ও শল্যায়নের সাহায্যে, বৃদ্ধকে যুবকে রূপান্তরিত করার কৌশল হিন্দ

বৈজ্ঞানিকরা জানতেন। সেই বিদ্যা আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। আমরা নতুন যুগের মানুষ, যৌবনকে চিরস্থায়ী করে জরাকে জয় করব। পৃথিবীতে বৃদ্ধ বলে আর কোন কথা থাকবে না। কাজ ও ভোগের মধ্যে আমাদের পৃথিবীর চাকা চলবে।

এই প্রতিভাবান, যৌবনদীপ্ত বিজ্ঞানীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রণব আর কোন কথা বলতে পারল না, সেই কুকুরটা কিন্তু সাত দিন বাদে মারা গেল। ডাঃ কুশারি বললেন, ওর রক্তে পিটিউটারির বিরোধী প্রতিবস্তু সৃষ্টি হয়ে গেছে। তার ফলে সংযোজিত পিটিউটারি গ্ল্যান্ডটা ধ্বংস হয়ে গেছে। রক্তের এই অ্যানটিবডি বা প্রতিবস্তু যাতে ভবিষ্যতে সংযোজিত পিটিউটারির কোন ক্ষতি করতে না পারে, তার উপায় আমাকে উদ্ভাবন করতে হবে।

এর বেশ কিছুদিন পরে হঠাৎ একটা কাণ্ড হল, যেটা প্রণব ও ডাঃ কুশারির জীবনের মোড়কে ঘুরিয়ে দিল। একদিন রাত্তিরে একজন সদ্য বিবাহিতা যুবতী আগুনে পুড়ে ডাঃ কুশারির নার্সিং হোমে ভর্তি হল। বিয়ের অল্প কিছু দিন পরেই দেনা-পাওনা নিয়ে শ্বশুর বাড়ীতে তার ওপর অত্যাচার হওয়াতে যুবতীটি আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে। আগুন তার খুব বেশী ক্ষতি না করলেও মুখটা ঝলসে সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। হাসপাতাল থেকে ফিরে বাড়ীতে গিয়ে সে বিবাহ বিচ্ছেদ করে। তারপর ডাঃ কুশারির কাছে একদিন রাত্রে ফিরে এসে বলে, ডাক্তারবাবু এ পোড়া মুখ আমি আর দেখাতে পারব না। আমি শান্তিতে মরতে চাই, আমায় এমন একটা ওষুধ দিন, যাতে ঘুমের মধ্যে দিয়ে বেদনাবিহীন ভাবে আমার মৃত্যু হয়। চেম্বারে তখন আর কোন রোগী ছিল না। ডাঃ কুশারি তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন আমি যদি তোমাকে এক অসামান্য সুন্দরীতে রূপান্তরিত করতে পারি, তাহলেও কি তুমি মরতে চাও? যুবতীর চোখে ঝিলিক খেলল। সে বলল, আমার ভবিষ্যত বলে কিছু নেই। আমার কাছে স্বামীর ও বাপের দুই কুলই আজ মৃত। পরমাসুন্দরী হবার পর আমি কি করব? মুখে একটা বিচিত্র হাসির তরঙ্গ তুলে ডাঃ কুশারি বললেন, তুমি আমার সঙ্গেই সব সময় থাকবে। আমার কাজে সাহায্য করবে। আমার লোকের প্রয়োজন। যুবতীটি রাজী হয়ে গেল।

তারপর কয়েকটা দুরূহ এবং জটিল প্লাস্টিক সার্জারীর শল্যায়নের পর

দু' এক মাসের মধ্যে যুবতীর মুখের চেহারা বদলে গেল। পোড়া চামড়াগুলোর ওপরে উরুর ভেতর থেকে নেওয়া চামড়া সংযোজিত করে টান টান করে দেওয়া হল। মসৃণ, সুডোল মুখমণ্ডল গড়ে উঠল। কাঁধ থেকে একটা তিল তুলে এনে সেই মুখে বসিয়ে সুষমা বাড়িয়ে তোলা হল। নাকটাকে টিকালো করে, পুড়ে যাওয়া ভ্রূ নতুনভাবে সংযোজিতে করা হল। ফলে মুখে অপূর্ব ভ্রূ ভঙ্গি দেখা ছিল। মাথার চুল পুড়ে গিয়ে টাকের সৃষ্টি হয়েছিল। নতুন করে সে জায়গায় কানের পাশ থেকে চুল তুলে সংযোজিত করা হল। যুবতীর মুখের আদল বদলে গেল। তার মুখের পোড়া দাগগুলো ঢাকবার জন্য ডাঃ কুশারি এক নতুন প্রক্রিয়ায় মেলানিল পিগমেণ্ট মেটাবলিজমের অদল বদল ঘটালেন। ফলে যুবতীর গায়ের রং-এর শুভ্রতার ঝিলিক দেখা দিল।

এই সমস্ত শল্যায়নের কাজে প্রণব তাঁকে পুরো সহায়তা করল। দিন রাত সে ডাঃ কুশারির নার্সিং হোম ও টালিগঞ্জের বাড়িতে পড়ে রইল। তারও কেমন যেন একটা ঝোঁক চেপে গিয়েছিল। গবেষণা করার জন্য একটা দুর্নিবার আকর্ষণ। এক্সপেরিমেণ্টের ফল কি হয় দেখবার জন্য সে উন্মুখ হয়েছিল। ডাঃ কুশারি তাকে বললেন,—মেলোনিল নামে যে রঞ্জক পদার্থ আমাদের শরীরে আছে, রক্তে তার ঘনত্বের পরিমাণের জন্যেই মানুষের গায়ের ও চুলের রং কালো হয়, তুমি তো জান। এই মেলোনিল রঞ্জকের বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে গায়ের রং সাদা বা কালো করা যায়। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান এখনও এই বৃৎ কৌশল আয়ত্ব করতে পারে নি। আমি অনেকদিন ধরে গিনি পিগদের ও সাদা ইঁদুরের ওপরে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে নতুন প্রযুক্তির কলা কৌশল উদ্ভাবন করেছিলাম। এ পর্যন্ত কাউকে জানাইনি, তোমাকেই প্রথম জানালাম। এই মেলোনিল রঞ্জক পদার্থের একটু হেরফের হলে রোগীর দেহে শ্বেতি দেখা দেবে। গায়ের ও মাথার চুলও সাদা হয়ে যাবে। মানুষের ওপর এই প্রথম পরীক্ষা চালিয়ে আমি সফল হয়েছি।

প্রণব মুগ্ধ বিস্ময়ে এই প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর কথা শুনছিল। তার চোখের সামনে শানিত ছুরি ও সন্নার যাদুস্পর্শে কিভাবে একজন যুবতীর শারীরিক রূপান্তর ঘটতে পারে চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না। এ যে খোদার ওপর খোদকারি চলছে। বিজ্ঞান আজ কি না করতে পারে। তবু

তার মনে একটা কিন্তু থেকে যায়। ডাঃ কুশারির এক্সপেরিমেণ্টের সমস্ত ফসলই কি আইন গ্রাহ্য ? নৈতিক দিক থেকেও কি সেগুলো সমর্থিত হবে ?

একমাস পরে নার্সিং হোমের গোপন প্রকষ্ট থেকে রূপলাবণ্যময়ী যে রূপসীটি বেরিয়ে এল তার সঙ্গে কয়েক মাস আগেকার আত্মহত্যা প্রয়াসী যুবতীর কোন মিল ছিল না। তার চলনে বলনে গ্রীবা বাঁকিয়ে কথা বলার ধরনে, অপূর্ব ভ্রূভঙ্গী করে টোল খাওয়া গালে সুষমাময় মুখমণ্ডলে হাসির ঝিলিক তোলার কায়দায় যে যুবতীটিকে এবার দেখা গেল, তার সঙ্গে মৃত্যু পথ যাত্রী সেই নববধূর কোন মিল ছিল না।

ডাঃ কুশারি হেসে বললেন,—তোমাকে আমি এবার থেকে মায়াবী বলেই ডাকব।—মায়াবী···। যুবতীর কণ্ঠে যেন কথাটা আটকে গেল। হ্যাঁ ঠিক তাই। পাইপটা ধরিয়ে ডাঃ কুশারি প্রণবের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন,—মায়াবী রাক্ষসীরা মায়াজাল বিস্তার করে নিজেদের চেহারার আদল, কথা বলার ধরন সব কিছু বদলে দিয়ে কুহকের সৃষ্টি করত।—তার মানে আমি রাক্ষসীতে রূপান্তরিত হয়েছি। কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে মায়াবী ভ্রূ বাঁকালো। সে কথায় কান না দিয়ে ডাঃ কুশারি বললেন—তুমি আমার একটা সাকসেসফুল এক্সপেরিমেণ্ট। তোমাকে আমি আমার যোগ্য সহকারী ও সহচরী করে তুলব।

এরপর থেকে ডাঃ কুশারির সঙ্গে মায়াবীর ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেল। সে নার্সিং-এর এবং অপারেশন থিয়েটারের কাজও চটপট শিখে নিল। নার্সিং হোমের অন্যান্য নার্সরা এব্যাপারে আদপে পছন্দ না করলেও প্রতিবাদ করার সাহস কারুর ছিল না। ডাঃ কুশারি মায়াবীকে নিয়ে গাড়ি করে প্রায়ই উইক এণ্ড বেরিয়ে যেতেন। কলকাতার আশে পাশে হোটেল ও ভ্রমণ কেন্দ্রগুলো তাঁরা ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ডাঃ কুশারি যখন থাকতেন না প্রণব তখন নার্সিংহোমের তদারক করত। তাঁর চেম্বারের রোগীদেরও সে দেখাশুনা করত। প্রণব ততদিন এম. এস পাশ করে গেছে।

একদিন রাত্রিবেলা নার্সিংহোমের একটা রোগীর অবস্থা খারাপ থাকায় প্রণব তাকে দেখতে এসেছিল। রোগীকে পরীক্ষা করে, ডাঃ কুশারির স্পেশাল চেম্বারে আলো জ্বলছে দেখে, কৌতূহলী হয়ে প্রণব সে ঘরে গেল। এঘরে প্রণব ছাড়া আর কারও আসার অধিকার ছিল না।

দরজায় টোকা মারতে গিয়ে প্রণবের হাত থেমে গেল মায়াবীর গলা শুনে। মায়াবী বলছে—কুশল অনেকদিন তো হল, তুমি কি আমায় বিয়ে করবে না? জানলার ফাঁক দিয়ে প্রণব দেখল ঘনিষ্ট আলিঙ্গনে তাঁরা দুজনে বসে আছে। কুশল হেসে বলে—বিয়েটাই কি বড় কথা? প্রণব আর দরজায় টোকা দিতে পারল না। সে পা টিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল।

এরও বেশ কিছুদিন পরের কথা। প্রণবের একবন্ধু ডাঃ অমলেশ জানা একদিন হাসপাতালে প্রণবকে বলল—তোমাদের কি খবর হে? আমার একজন আত্মীয় আই. বির বড় অফিসার। কথায় কথায় সে একদিন বলল, তোমাদের নার্সিং হোমের ওপর পুলিশ দৃষ্টি রেখেছে। উর্বশী মার্কা কোন এক ভদ্রমহিলার আবির্ভাব তাদের কাজ বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রণব বিস্মিত হয়ে কারণ জানতে চাইলে অমলেশ আর বেশী কিছু বলতে পারল না। শুধু বলল—সাবধানে থেক। ডাঃ কুশারি বড় ডাক্তার হতে পারেন; কিন্তু ভিন্ন ধরনের মানুষ। পুলিশের চোখে তাঁর ধরন ধারণ ভালো ঠেকছে না। তুমি যেন এর মধ্যে জড়িয়ে পড় না। অমলেশ কিছুদিন পরে বদলি হয়ে মেদিনীপুরে তার বাড়িতে চলে গেল।

একদিন সন্ধ্যায় ডাঃ কুশারির ফোন পেয়ে প্রণব হন্তদন্ত হয়ে তাঁর টালিগঞ্জের বাড়িতে গেল। ডাঃ কুশারি তাঁর ড্রইংরুমে বসে পাইপ ধরালেন। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললেন,—দেখ প্রণব আমি শিগগীরই এ দেশ ছেড়ে চলে যাব।—সে কি!……কেন? প্রণবের সামনে যেন বজ্রপাত হল। কারণ ডাঃ কুশারিকে অবলম্বন করেই প্রণবের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হচ্ছিল। তার নিজের বলতে কিছুই ছিল না।

পাইপটায় টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে, ডাঃ কুশারি বললেন,—আমি ইংলণ্ডে এফ. আর. সি. এস করতে যাচ্ছি। তারপর সুইডেনের উপাসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ কোহেনের তত্ত্বাবধানে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে ডক্টরেট করব। তিনি জেরেনটোলজি বা বার্ধক্য বিদ্যার ওপর অনেক কাজ করেছেন। কি করে বৃদ্ধদের সক্রিয় ও পুনর্যৌবিত করা যায় তা নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করছেন।
—পুনর্যৌবিত? বিস্মিত হয়ে প্রণব প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, তোমাকে আগেই বলেছি। এঁদের সঙ্গে আমি অনেক দিন ধরে

যোগাযোগ রাখছি। বৃদ্ধদের কিভাবে যুবক করা যায় তার উপায় অনেক দিন ধরে এঁরা ভেবে আসছেন। পৃথিবীর কিছু কিছু জায়গায় এ নিয়ে কাজ হচ্ছে। সুইডেনেই এ নিয়ে সব থেকে বেশী অগ্রগতি হয়েছে।

বৃদ্ধদের যৌবন কিভাবে ফেরান যায়; কোনদিন যে সেটা বাস্তবায়িত হতে পারে এ নিয়ে প্রণব কোন কিছু চিন্তা করতে পারছিল না। হঠাৎ তার মনে সেই বৃদ্ধ কুকুরটাকে যুবক কুকুরে রূপান্তরিত করার ঘটনার কথা মনে হল। ডাঃ কুশারি কি সেই রকম কিছু করতে চলেছেন। প্রণবকে নিরুত্তর দেখে, কুশল জিজ্ঞেস করে এত কি ভাবছ? তখন প্রণব অমলেশের সেই সতর্ক বাণীর কথা কুশলকে জানাল। কুশলের মুখ গম্ভীর হল। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি বললেন, দেখ, এই পৃথিবীতে নতুন কোন আবিষ্কার বা উদ্ভাবন সহজ ভাবে আসেনি। ডাঃ হান্টারের পেছনেও পুলিশ একদিন এভাবে লেগেছিল। আমার গবেষণা যদি সফল হয় তাহলে পৃথিবীতে একদিন যুগান্তর আসবে। বৃদ্ধ বলে আর কিছুই থাকবে না। মানুষ মরণশীল। সে একদিন মরবেই; কিন্তু সে সারাজীবন কর্মক্ষম থাকবে। বৃদ্ধ হয়ে পরনির্ভর হয়ে তাকে বাঁচতে হবে না।

পাইপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে, থুতনিতে ডান হাতের তালু রেখে চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগলেন, দেখ প্রণব তুমি বুদ্ধিমান ছাত্র। তোমার উচ্চাশা আছে। কিন্তু সাহস নেই। তোমার বুদ্ধি ও শেখবার আগ্রহ দেখে আমি নিজের হাতে তোমায় অনেক কিছু শিখিয়েছি। এরপর তোমায় একটা নতুন শল্যায়ন শেখাব, যা পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত কেউ করে নি। এমন সময় ঘরের টেলিফোনটা হঠাৎ ঝন ঝন করে বেজে উঠল। ফোনটা ছেড়ে দিয়ে গম্ভীর মুখে ডাঃ কুশারি বললেন মায়াবী ফোন করছিল।

প্রণব ফস করে প্রশ্ন করে বসল, আপনি না থাকলে মায়াবীর কি হবে? সে কোথায় যাবে? ডাঃ কুশারির চোখ দুটো দপ করে জ্বলে ওঠে। তারপরে পাইপটা মুখে দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে থাকেন এই পৃথিবীতে কারুর জন্য কিছু আটকে থাকবে না। আমি ইউরোপ যাবার আগে নার্সিং হোম, বাড়ি সবকিছু তোমার নামে লিখিয়ে দেব। প্রণব চমকে উঠে বলে···আমার নামে? একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ডাঃ কুশারি বলেন—সমস্ত সম্পত্তির একটা ট্রাস্ট থাকবে। সব কিছু তদারক করার ভার তোমার ওপর বর্তাবে। আগামী শনিবার আমি

এক দুরূহ শল্যায়ন করব। মস্তিষ্কের পিটিউটারিগ্রন্থি বদল করাব। এর আগে কুকুর ও বাঁদরের ওপর সফল হয়েছি। বাঁদরের গ্রন্থি বদলের কথা অবশ্য তোমার জানা নেই। এবার মানুষের ওপর করব। মানুষ···। উত্তেজিত কণ্ঠে প্রণব চেঁচিয়ে উঠল—মানুষ পাবেন কোথা থেকে ?

আমার কাছে একজন বৃদ্ধা কিছুদিন ধরে আশ্রয় ও খোর পোষ চাইছেন। তাঁর সংসারে কেউ নেই। দু'বেলা দুমুঠো খেতে পায় না। তাকে আমি এই শল্যায়নের কথা বলে রাজী করিয়েছি। আর সুস্থ সবল যৌবনোচ্ছল মানুষটাকে শল্যায়ন কক্ষে দেখতে পাবে। প্রণব বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে চিত্রাপির্তের মত তাকিয়ে থাকে।

[তিন]

শনিবারের এক ধূসর সন্ধ্যা।

কলকাতার চৌরঙ্গী পার্কষ্ট্রীট অঞ্চলের বাড়ীগুলো তখন আলোর মালায় দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে। রাস্তাগুলো নিয়ন ও মার্কারি লাইটের আলোর ছটায় দীপান্বিতা। পশ্চিমে গড়ের মাঠ থেকে একটা মনোরম হাওয়া বয়ে আসছে পার্কষ্ট্রীট ও চৌরঙ্গী হোটেল ও দোকানগুলো খদ্দেরের ভীড়ে সরগরম উঠেছে। রাতের কলকাতা পুরানো সাহেব পাড়ার এক স্বতন্ত্র রূপ। রূপসী কলকাতার অভিজাত রূপটা এখানে দ্যুতিময় হয়ে ওঠে। নার্সিংহোমে গাড়িটা পার্ক করে চাবিটা ঘোরাতে ঘোরাতে কার্পেট মাড়িয়ে দোতলার রিসেপসানে এসে প্রণব জানল ডাঃ কুশারি তখনও এসে পৌঁছাননি। এধরনের দুরূহ জটিল শল্যায়নের গোপনীয়তা যে রক্ষা করা হবে; প্রণব তা জানত। কথা বলে সে বুঝল আজ রাত্রে কোন অপারেশন রাখা হয় নি। নার্সিংহোমের স্টাফরা বিশেষ কেউ নেই। শল্যায়নের কথাটা তাহলে কেউই জানে না। মায়াবী নিশ্চয় জানে। করিডোর পেরিয়ে প্রণব মায়াবীর ঘরের দিকে গেল। সুইংডোর ঠেলে এয়ার কন্ডিশান ঘরটায় ঢুকতেই গুড্ ইভনিং ডঃ মুখার্জী বলে মায়াবী তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাল। মায়াবীর

চুলগুলো আলু থালু হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তার উজ্জল সুডৌল মুখে একটা বিষণ্ণ গাম্ভীর্যের প্রলেপ। ঝকঝকে সুন্দর চোখ দুটো চিন্তা ক্লিষ্ট। প্রণব সরাসরি তাকে প্রশ্ন করে তুমি আজকের রাতের কোন অপারেশনের কথা জান মায়াবী, ফ্যাকাসে হাসি মায়াবীর সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। যেন শরতের ভোরের ঝরা শিউলি ফুল। বিষণ্ণ ভাবে সে বলল, এই বিশেষ গোপন শল্যায়নের কথা আমাকে তো জানতে হবেই। তার কারণ আমার ওপরেই যে অস্ত্রোপচার চলবে।···সেকি!! অসহ্য বিস্ময়ে প্রণব আর্তনাদ করে উঠল।

মায়াবী বলে চলল—আপনি তো জানেন ডঃ মুখার্জী, কুশলকে আমি ভালবাসি। তার একটা অদ্ভুত আকর্ষণ, অদ্ভুত সম্মোহনী জাদু আছে। তাই সে যখন আমাকে এই প্রস্তাব দিল, তখন আমি না করতে পারলাম না। আমি ভাল ভাবেই জানি আপনারা আমাকে এক্সপেরিমেণ্টের গিনিপিগের মতো ব্যবহার করছেন।···না···না আমি না। প্রণব চেঁচিয়ে বলে উঠল। আমি শুধু এই শল্যায়েনে ডাঃ কুশল কুশারির একজন সহকারী মাত্র। এই শল্যায়নের সমস্ত আয়োজন প্রয়োগ পদ্ধতি ডাঃ কুশারিই ঠিক করেছেন। আমি এর বিন্দু বিসর্গও জানি না; কিন্তু আপনি এই ধরনের গিনিপিগ হতে রাজী হলেন কেন? প্রণবের কণ্ঠে একটা বিস্ময় মিশ্রিত, নৈরাশ্যব্যাঞ্জক সুর ধ্বনিত হয়। মায়াবী দু'হাতে মুখ ঢেকে বলে, কুশলের চুম্বকের মত আকর্ষণ আমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারি না। সেই আমার প্রাণ দিয়েছে। তাঁর ইচ্ছাই আমার কাছে আদেশ।

শল্যায়ন কক্ষের বাইরে সার্জেনের বেশবাস পরার সময় প্রণব জিজ্ঞেস করে মায়াবীকে নিয়ে এই অদ্ভুত বিপদজনক এক্সপেরিমেণ্ট করছেন কেন? কুশলের চোখে যেন বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে, তিনি বললেন,—কি বললে, এক্সপেরিমেণ্ট?— হ্যাঁ এক্সপেরিমেণ্ট ছাড়া পৃথিবীতে ভালো কাজ করা যায় না। দরকার হলে নিজের ওপরও আমায় এক্সপেরিমেণ্ট করতে হবে। আমার পরীক্ষা আমি সফল করে তুলবই। জরাকে আমি জয় করবই। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে অনন্ত যৌবন নিয়ে রূপ রস গন্ধ ভরা পৃথিবী ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা আমি করব। জানত, কবি বলেছেন,—

"রক্তে আমার অমনি গতির নেশা"
নাসায় অগ্নি স্ফুরিছে, কণ্ঠে—হ্রেষা।

মাথায় টুপি, মুখে মুখোশ, সবুজ আলখাল্লা পরে তারা শল্যায়ন যখন শেষ করল তখন মাঝরাত পেরিয়ে গেছে।

ডাঃ কুশারি নার্সিংহোমে একনাগাড়ে দুদিন ধরে পড়ে রইলেন। বাইরে বেরোলেন না। রোগীদের প্রণবই দেখাশোনা করতে লাগল। সে এম· এস পাশ করে যাওয়ায় তারও নাম ডাক হয়েছে। সকলকে বলা হল ডাঃ কুশারি মায়াবীকে নিয়ে চেঞ্জে গেছেন। বাইরের কেউ এই গোপন শল্যায়নের ব্যাপারে জানতে পারল না।

তিনদিন পরে রাত্রিতে প্রণব শল্যায়ন শেষে যখন সার্জেনস রুমে বসে বিশ্রাম করছিল, তখন ফোন বেজে উঠল। ডাঃ কুশারি তাঁর গোপন কক্ষে প্রণবকে ডাকছেন। ঘরের পর্দা সরিয়ে প্রণব যখন কুশলের ঘরে ঢুকল। তখন কুশল তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, অপারেশন ইস্ সাকসেসফুল। চল দেখবে চল। সেই বৃদ্ধার ঘরে গিয়ে প্রণব অবাক। বৃদ্ধা একজন সুন্দরী যুবতীতে রূপান্তরিত হয়েছে। থোকা থোকা কাঁচা চুল তার মাথার উপর ঝুলে পড়েছে। কুঁচকে যাওয়া চামড়াগুলো মসৃণ সুডৌল হয়েছে, চোখে কটাক্ষ, মুখে পাণ্ডুর হাসি। প্রণব বুঝল এটা শল্যায়নের পরের দুর্বলতা।

—কেমন আছেন আপনি? ডাঃ কুশারির প্রশ্নে স্মিত হেসে রূপান্তরিত যুবতী উত্তর দিলেন— পৃথিবীকে বড় সুন্দর লাগছে। আমি আবার নতুন করে বাঁচবো। আপনাকে ধন্যবাদ।

এরপর প্রণবকে মায়াবীর ঘরে নিয়ে ডাঃ কুশারি ঢুকলেন। আশ্চর্য! কোথায় মায়াবী?···একটা জরাগ্রস্থ শুভ্রকেশী কঙ্কালসার বৃদ্ধা বিছানায় শুয়ে আছে।

কুশলকে দেখেই, খোনা খোনা গলায় বলে উঠল,—তুমি আমার একি ক্ষতি করলে কুশল? এর থেকে আমায় মেরে ফেললে ভাল হত। তারপর প্রণবের দিকে তাকিয়ে আর্ত কণ্ঠে বলে উঠল,—এ পাপের ভাগ আপনাকেও নিতে হবে ডাঃ মুখার্জী। আপনারা দুজনে মিলে আমার সর্বনাশ করেছেন। ভাবাবেগে মায়াবী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। তাকে চাঙ্গা করে তোলার জন্যে ডাঃ কুশারি সঙ্গে সঙ্গে একটা ইনজেকসন্ দিলেন।

বাইরের ঘরে এসে প্রণব উত্তেজিত কণ্ঠে বলল,—আপনি অসাধ্য সাধন

করেছেন ডাঃ কুশারি। কিন্তু এ অন্যায়। মায়াবীর জীবনকে আপনি এভাবে নষ্ট করে দিতে পারেন না। ডাঃ কুশারির হাসিটা বড় ফ্যাকাশে ঠেকল। ঠিক যেন ব্ল্যাক আউটের রাতে জ্বলা রাস্তার আলো। তিনি থেমে থেমে বলতে লাগলেন,—দেখ প্রণব বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে সব সময় ক্ষুদ্রতর স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়। আমার এই আবিষ্কারের গবেষণা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনযাত্রার রূপ রেখা বদলে দেবে।

এর ঠিক দুদিন পরেই মায়াবী মারা গেল। আর সেই বৃদ্ধা যুবতীও দিন চোদ্দ বাদে মারা গেল। বোঝা গেল শল্যায়ন সফল হলেও, রোগীকে জিইয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। শরীরের ইমিউনিটি অপরের পিটিউটারিকে বর্জন করছে। রক্তের এই প্রতিক্রিয়াকে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। ডাঃ কুশারির গবেষণায় তাই ফাঁক থেকে যাচ্ছে।

এর ঠিক এক মাস বাদেই ডাঃ কুশারি ইংলন্ড চলে গেলেন। প্রণবকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন।

এই সময় একদিন প্রণবের কাছে ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের পুলিশ অফিসার মিঃ ভদ্র এসে হাজির হলেন। মায়াবীর মৃত্যু সম্পর্কে তিনি জেরা করতে লাগলেন। প্রণবকে বলতে হল, তার একটা জরুরী শল্যায়নের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সব কিছু চেপে গিয়ে প্রণব জানাল মায়াবীর মস্তিষ্কের শিরা ছিঁড়ে যায়। সেটার ওপর শল্যায়ন করতে গিয়েই সে মারা যায়। মিঃ ভদ্রের চোখে মুখে কিন্তু সন্দেহ রয়েই গেল। প্রণব বাধ্য হয়ে তার বন্ধু অমলেশ জানাকে একদিন ফোন করে তার বিপদের কথা জানাল। অমলেশের প্রভাবে পুলিশ এ ব্যাপারে আর কোন তদন্ত করল না। তবে ডাঃ কুশারির নামটা পুলিশের খাতায় রয়েই গেল।

[চার]

ডাঃ কুশারির কাছ থেকে মাসে মাসে প্রণব চিঠি পেত। ইংলন্ড থেকে এফ. আর. সি. এস. পাশ করার পরে সুইডেনে তিনি ডক্টরেট করতে যান। সেখানে ডক্টরেট করার পর আবার আমেরিকায় গবেষণার জন্য চলে যান।

তারপর বহু বছর ডাঃ কুশারির কোন খবর সে পায় নি। মাষ্টার অব সার্জারী করার পর প্রণব এম. সি. এইচ পাশ করে। তার পসার ও প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বেড়ে যায়। সে এখন কলকাতার একজন দিকপাল সার্জেন। মেডিকেল কলেজে পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে নার্সিং হোমগুলো চালিয়ে থাকে।

একদিন গভীর রাত্রে প্রণব নিজের ঘরে শুয়েছিল। তার ছেলে অনির্বাণ তখন দশ-বারো বছরের হয়ে গেছে। প্রণব একলাই তার বেডরুমে শুত। বিছানার কাছে টেলিফোন রাখা থাকত। রাত্রিতে ফোন এলে যাতে অন্য কারুর ঘুমের ব্যাঘাত না হয় সেইজন্য এই ব্যবস্থা। একদিন রাত্রে গভীর সুষুপ্তির মধ্যে প্রণবের মনে হল সে যেন সমুদ্রের মাঝখানে একটা জাহাজে রয়েছে। আর জাহাজটা সমুদ্রের নীচে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে। জলের ভেতর থেকে মৃত্যুর ঘণ্টা ভেসে আসছে। আতঙ্কে প্রণবের সারা শরীর ঘেমে গিয়েছিল। সে চেঁচাতে চাইছিল, কিন্তু পারছিল না। হঠাৎ এক ঝটকায় তার ঘুমের আমেজটা ভেঙে গেল। প্রণব বুঝতে পারল তাকে বোবায় ধরেছিল। মনের অচেতন স্তরে, কোন ভয় বা অপরাধ থাকলে, স্বপ্নের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন রূপ ধরে এক ধরনের নাইটমেয়ার মস্তিষ্কের কোষে কোষে প্রতিবিম্বিত হতে থাকে। টেলি-ফোনের ঝনঝন শব্দটা এবার কানের পর্দায় স্পষ্টতর হয়ে বাজতে থাকে। প্রণব ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছিল। ঘুমটা ভেঙে বাস্তবের স্তরে আসতেই সে স্বস্তি বোধ করে। পাষাণরূপ আতঙ্কটা বুক থেকে নেমে যায়।

—হ্যালো, ওপার থেকে একটা জড়ানো কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

—ডাঃ মুখার্জী স্পীকিং। চিকিৎসক সুলভ গলায় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে প্রণব বলে।

—প্রণব, আমি ডাঃ কুশারি বলছি। কুশলদা আপনি! প্রণব যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। এক যুগের ওপর হয়ে গেছে ডাঃ কুশারির সম্পর্কে কোন খবর সে সারা দুনিয়া থেকে জোগাড় করতে পারে নি। তার ধারণা হয়েছিল, ডাঃ কুশারি মারা গেছেন।

আবার সেই অস্পষ্ট জড়ানো সুরে সংলাপ শোনা গেল—প্রণব—বেশী কথা বলার সময় নেই। আমি এখনও বেঁচে আছি। আগামীকাল সন্ধ্যের পর নার্সিং হোমে কোন অপারেশন রেখো না। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলব! ফোনটা কেটে গেল।

পরের দিন সন্ধ্যায় নার্সিং হোমের সব ভীড় হালকা করে দিয়ে নিজের চেম্বারে বসে প্রণব গভীর ভাবে ভাবছিল। ডাঃ কুশারি এতদিন কোথায়, কিভাবে ছিলেন? তাকে কোন খবর এতদিন দেননি কেন? হঠাৎ ডাঃ কুশারির এই রকম আবির্ভাবের উদ্দেশ্যটাই বা কী? নিশ্চয় তার কোন জরুরী প্রয়োজন আছে। প্রণবের বয়স এখন পঞ্চাশ বছর। তার মানে ডাঃ কুশারি এখন ষাট বছরের বৃদ্ধ। ডাঃ কুশারির চুলে নিশ্চয় এখন পাক ধরেছে। বেশ কয়েক বছর আগেকার আর একটা সন্ধ্যার কথা মনে পড়ল, ডাঃ কুশারি তাঁর জরুরী প্রয়োজনে এভাবেই প্রণবকে এই নার্সিং হোমে আহ্বান জানিয়েছিলেন। মায়াবীর ওপর সেই নিষ্ঠুর শল্যায়ন। তারপর সেই মর্মান্তিক পরিণতি।

খুট্‌ করে দরজায় একটা শব্দ হল। কাম্‌ ইন্‌—প্রণবের কথা শেষ হতে না হতে, দরজা ঠেলে দীর্ঘদেহী এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। তাঁর মাথায় হ্যাট্‌, চোখে গগলস্‌, গালে ফ্রেঞ্চকাট কালো দাড়ি গোঁফ। গলায় মাফলার জড়ানো। হাতে পশমের দস্তানা। গায়ে দীর্ঘ কালো রঙের ওভার কোট, পরনে দামী ইংলিশ সার্জের স্যুট। কলকাতার শীতে ওভার কোটের দরকার হয় না। বোঝা যায় যে, ভদ্রলোক বিদেশ থেকে এসেছেন। কে আপনি? সাশ্চর্যে প্রণব জিজ্ঞেস করতেই কালো গোঁফ দাড়ির ভেতর থেকে ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে এল।

আমি ডাঃ কুশারি। দেঁতো হাসি হেসে ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে দিলেন। প্রণব উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন করল।

ওভার কোট, টুপি ও মাফলার হ্যাঙারে ঝুলিয়ে ডাঃ কুশারি পাইপটা মুখে ধরালেন। প্রণব অবাক হয়ে দেখল, ডাঃ কুশারির অকৃত্রিম কালো চুল দাড়ির মধ্য দিয়ে যৌবনোচ্ছল এক সুপুরুষের ব্যক্তিত্ব ঠিকরে পড়ছে। কে বলবে তাঁর এখন ষাট বছর বয়স, মনে হচ্ছে চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের কোন যুবা পুরুষ তার সামনে বসে আছে।

পাইপটা টেবিলের ওপর ঠুকতে ঠুকতে ডাঃ কুশারি বললেন, ধূমকেতুর মতো আমার আকস্মিক আবির্ভাবে তুমি খুব বিস্মিত ও বিচলিত বোধ করছ বুঝতে পারছি। সংক্ষেপে তাই তোমাকে ঘটনাগুলো বলছি। লণ্ডন ও এডিনবরা থেকে এফ. আর. সি. এস. করার পর আমি স্টকহলমে যাই। জেনেটিক-

ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ওপর সেখান থেকে ডক্টরেট করি। মানুষের দেহে প্রতিটি কোষের ভেতরে যে জিন বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলো কিভাবে বংশানুক্রমিকভাবে মানুষের শারীরিক ও মানসিক ধারা বহন করে চলেছে, তা ভাবলে বিস্ময় লাগে। এই জিনকে বদলে মানুষের ও তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের রূপান্তর ঘটানো যায়। মানুষকে দীর্ঘায়ু করার ও চিরযৌবন ধরে রাখার যে দুরূহ ও জটিল গোপন গবেষণা সেখানে চলছে, সে সম্পর্কে আমি হাতে কলমে কিছু শিক্ষা নিই।

সেখান থেকে আমেরিকায় গিয়ে, হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি এ সম্পর্কে কিছু কাজ করি। আমার ভুল হয়েছিল—আমি মস্তিষ্কটা উপর থেকে কেটে একেবারে তলদেশে গিয়ে নস্যির কৌটোর মতো আধার থেকে পিটিউটারিকে বার করে আনতাম। তার বদলে নাকের ভেতর দিয়ে পিটিউটারির ওপর শল্যায়ন করা বা পরীক্ষা চালানো অনেক সহজ ও নিরাপদ। নাকের ভেতর দিয়ে পিটিউটারির ধমনীর ভেতর, পিটিউটারি নির্যাস ইনজেকসন করে পিটিউটারিকে উজ্জীবিত করা অনেক সহজ। এতে রোগীর রক্তের ইমিউনিটি বা প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করা হয় না। কমপিউটার-এর সাহায্যে কার কি পরিমাণ এই হর্মোণ প্রয়োজন তাও নির্ভুলভাবে জানা যায়। এই বলে তাঁর হাতের অ্যাটাচিটা খুলে, তার ভেতর থেকে কমপিউটার সংযুক্ত যন্ত্র তিনি বার করলেন। তাঁর প্রয়োগ কৌশল ও শল্যায়নের খুঁটিনাটি তিনি প্রণবকে বুঝিয়ে চললেন। এরপর বললেন,—দেখ প্রণব, এই দুরূহ সূক্ষ্ম শল্যায়নের কৃত কৌশল আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। এই শল্যায়নের প্রভাব পঁচিশ থেকে তিরিশ বছর পর্যন্ত থাকে। তার মানে মানুষের যৌবন এই সময় পর্যন্ত অটুট থাকবে।

প্রণব এবার বাধা দিয়ে বলে,—কিন্তু আপনি এতদিন কি ভাবে, কোথায় ছিলেন?—আমি চরকির মত ইউরোপ ও আমেরিকা ঘুরেছি। মাঝে কিছুদিন বর্তমান পাকিস্তানের কাশ্মীরের হুনজা অঞ্চলে গিয়েছিলাম। সেখানকার অধিবাসীরা হুন বংশ জাত। তারা দীর্ঘদেহী কর্মঠ ও দীর্ঘকাল ধরে যৌবন ধরে রাখে। তাদের মস্তিষ্ক খুলে পিটিউটারির উপর পরীক্ষা আমি চালিয়েছি। পাকিস্তানের উত্তরে ভাসখণ্ড পেরিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় আমি ঘুরেছি। সেখানকার অধিবাসীরাও দীর্ঘায়ু ও কর্মঠ হয়। তুমি জান, বর্তমানে ইকোলাই

জীবাণুর জীন বদলে, ডায়াবেটিস রোগীদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ভবিষ্যতে এর ফলে ডায়াবেটিস বলে কোন রোগ থাকবে না। মানুষের জিনও এইভাবে বদলে দিয়ে দীর্ঘায়ু ও কর্মক্ষম করা যায়।

প্রণব ফের বলে ওঠে,—আজকে এভাবে এতদিন পরে আপনি আমাকে কেন স্মরণ করলেন? সেটা কিন্তু এখনও খুলে বলেন নি।

একথা শুনে ডাঃ কুশারী গম্ভীর হয়ে বললেন,— আমাকে দেখে তোমার কত বছর বয়স বলে মনে হচ্ছে?

—পঁয়ত্রিশ বছরের বেশী তো কিছুতেই নয় প্রণব বলে। আমার বর্তমান বয়স ষাট। তার মানে অন্ততঃ পঁচিশ বছর বয়স কম আমায় মনে হচ্ছে। আমার এই অ্যাটাচির ভেতরে আমার আবিষ্কৃত পিটিউটারি গ্রন্থির নির্যাস রয়েছে। তোমাকে আমি যেভাবে বলছি ও দেখাচ্ছি; ঠিক সেভাবে নাকের ভেতর দিয়ে এই শলাকা ঢুকিয়ে আমার পিটিউটারি নব যৌবন ফিরিয়ে আনে। তার ফলে আমি আরও পঁচিশ থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই বয়স, এই যৌবন ধরে রাখতে পারব।

ডাঃ কুশারির কথা শুনে প্রণব বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল। কি অসম্ভব! কি আজগুবি কথা বলছেন ডাঃ কুশারি; কিন্তু তাঁকে দেখে কে বলবে তিনি ষাট বছরের বৃদ্ধ। প্রণবের ভাবান্তর দেখে ডাঃ কুশারি অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলেন—দ্বিধা কোরো না প্রণব! তোমাকে আমি নিজের হাতে এ্যানাটমি, সার্জারি শিখিয়েছি। তুমি আমার সব থেকে কৃতি ছাত্র। এখন আমার প্রয়োজনে এই উপকারটুকু কর। আমার পিটিউটারির আয়ু শেষ হয়ে আসছে। এই ইনজেকসন আমার পিটিউটারির ভেতর সরাসরি না দিলে আমি শিগগিরি স্থবির বৃদ্ধে পরিণত হব।

ডাঃ কুশারির অনুরোধ প্রণব উপেক্ষা করতে পারল না। মন্ত্রমুগ্ধের মত সে সেই গোপন কক্ষে শল্যায়ন করে চলল। ইথার দিয়ে ডাঃ কুশারিকে অজ্ঞান করা হল। মাথার দুপাশে ইলেকট্রোডের সংলগ্ন তারের সঙ্গে সংযুক্ত রইল যন্ত্রগণক বা কম্পিউটার। যন্ত্রগণকের মাথার ওপর বোতাম টিপে একটা পর্দা খাড়া করা হল। সেটা টেলিভিশনের পর্দার মত কাজ করতে লাগল। রাডারের পর্দায় যেমন ধরা পড়ে সেইরকম মস্তিষ্কের ভেতরকার শিরা, ধমনী ও রক্তজালিকা ও বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ পর্দায় প্রতিবিম্বিত হতে থাকল। নাকের ভেতর

দিয়ে শলাকা চালিয়ে নিখুঁতভাবে পিটিউটারির কাছে প্রণব পেঁছে গেল। ডাঃ কুশারির নির্দেশমত তাঁর আবিষ্কৃত পিটিউটারির এক্সট্র্যাক্ট পিটিউটারির রক্ত জালিকার ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হল। চটপট শল্যায়ন শেষ হয়ে গেল। কর্মপিউটারের তারগুলো খুলে সে অ্যাটাচিতে ভরে দিল। একটু পরেই চোখ মেললেন ডাঃ কুশারি। তারপর এক সময় টেবিল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, —প্রণব তোমায় অজস্র ধন্যবাদ। শরীরে আমি যথেষ্ট বল পাচ্ছি। তারপর অ্যাটাচি খুলে কর্মপিউটারের একটা বোতাম টিপে, গণনার অঙ্কগুলো দেখে বললেন—টেলিভিশনের ভোল্টেজ স্টেবিলাইজারের মত কর্মপিউটারও জানিয়ে দেয় পিটিউটারি কতটা লো ভোল্টে চলছে ও তার কতটা নির্যাস দরকার। সাবাস প্রণব সাবাস্। বলে তিনি করমর্দন করলেন। তারপর একটু থেমে—দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বললেন—আমি চলে যাচ্ছি। তবে তোমার কাছে লুইসাথিয়ার ডেল নামে যদি কেউ খোঁজ নিতে আসেন, তা হলে তাঁকে জানিও, আমার সম্বন্ধে তুমি বিন্দু বিসর্গও জানো না।

প্রণব এবার সাশ্চার্যে বলল—কিন্তু আপনি কোথায় যাচ্ছেন? কোথায় থাকবেন? আপনার ঠিকানাটা অন্ততঃ দিয়ে যান। বিনম্র হয়ে মৃদু হেসে ডাঃ কুশারি উত্তর দিলেন—এই বিরাট পৃথিবীর দেশে দেশে আমারঘর আছে। রক্তে আমার গতির নেশা···আমি জীবন ও যৌবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে চাই। আমাকে খোঁজ করার চেষ্টা করো না। প্রয়োজন মত আমি তোমাকে ঠিক খুঁজে বার করে নেব। বিদায় জানিয়ে ডাঃ কুশারি চলে গেলেন।

এই ঘটনার ঠিক একমাস বাদে আর এক কবোষ্ণ সন্ধ্যা। চেম্বারে বসে প্রণব একটার পর একটা রোগী দেখে যাচ্ছে। ডাঃ কুশারির কোন খবর আর সে পায় নি। ধুমকেতুর মত নার্সিংহোমে এসে তিনি উধাও হয়ে গেছিলেন। নার্সিংহোমের কেউই তাঁর এই গোপন আসা যাওয়ার কথা জানে না। চেম্বারের রোগীর ভীড় তখন পাতলা হয়ে এসেছে। এমন সময় বেয়ারা এসে একটা ভিজিটিং কার্ড দিয়ে গেল। বিদেশী কার্ড বুঝতে পেরে কৌতূহল বশতঃ সেই কার্ডের উপর প্রণব চোখ বোলাল। মিস্ লুইসাথিয়ার ডেল। বোস্টন সিটির একটা ঠিকানা। বেয়ারাকে সে তখনই ওই ভদ্র মহিলাকে ডেকে পাঠাতে বলল। বেয়ারা ফিরে এসে জানালো, মেমসাহেব গোঁ ধরে আছেন, তার অনেক কিছু

বলার আছে। সব রোগী চলে গেলে, শেষে তিনি ডাঃ মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করবেন।

টাইম ঘড়িতে টুং টুং করে যখন নটা বাজতে থাকল, তখন ওই মেমসাহেব লুইসা প্রণবের সামনের চেয়ারে এসে বসলেন। চেম্বারে তখন আর কোন রোগী নেই।

দীর্ঘাঙ্গী শুভ্রকেশী, আঁটোসাঁটো গড়নের লুইসাকে দেখে প্রণবের ডাঃ কুশারির শেষ সতর্ক বাণীর কথা মনে পড়ল। লুইসার সুন্দর মুখে কেমন যেন এক চিন্তার ছাপ। তিনি একটু উত্তেজিত ভাবেই কন্টিনেন্টাল উচ্চারণের ইংরেজীতে বললেন—ডক্, আমি সুইডিস্, জাত আমেরিকান। আপনাকে হয়ত বিরক্ত করছি; তবু একজনের খোঁজ করার জন্য আমি আজ এসেছি। সে ভদ্রলোকের নাম ডাঃ ইব্রাহিম পাশা। তিনি জাতে ইজিপ্শিয়ান হলেও এখন আমেরিকান হয়ে গেছেন। প্রণব মাথা নেড়ে বললে— না, ও নামে আমি কাউকে চিনি না। লুইসা তখন তাঁর ব্যাগ থেকে একটা ফটো বার করে প্রণবকে দেখিয়ে বললেন এনাকে কি আগে আপনি দেখেছেন? ডাঃ কুশারির ফটো দেখে চমকে উঠলেও প্রণব কিন্তু নার্ভাস না হয়ে বলল, হ্যাঁ, ডাঃ কুশারির ফটোটা আমি চিনতে পারছি। কিন্তু তিনি পঁচিশবছর আগে ইণ্ডিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। এখন বেঁচে আছেন কিনা বা কোথায় আছেন তাও জানি না।— পঁচিশ বছর আগে আপনি শেষ দেখেছিলেন? ভদ্রমহিলা যেন আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

প্রণব কথার মোড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল,— কিন্তু কি ব্যাপারে আপনি আমায় এসব প্রশ্ন করছেন জানতে পারি কি? লুইসা ভেঙ্গে ভেঙ্গে বললেন— আজ থেকে প্রায় ছ-সাত বছর আগে আমার বাবা অস্ট্রিয়ার সুইডিস্ এমব্যাসির ফার্স্ট সেক্রেটারি ছিলেন। আমি জাতে সুইডিস্ আগেই বলেছি। স্টকহল্‌ম-এ আমাদের বাড়ী। সাত বছর আগে আমি এক দিন ভিয়েনার অটোস্ত্রাদা বা মোটরওয়ে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে আসার সময় একটা দুর্ঘটনায় পড়ে জ্ঞান হারাই। ডাঃ ইব্রাহিম পাশা তখন ভিয়েনায় এক হাসপাতালে কাজ করতেন। আমেরিকা থেকে ভিয়েনার ইউনিভার্সিটির ও কিছু হাসপাতালের কাজকর্ম তখন পরিচালিত হত। এখনও হচ্ছে। ডাঃ পাশা আমেরিকান গভর্ণমেন্টের

তরফ থেকে তখন সেই হাসপাতালের সার্জারী বিভাগের কাজে ছিলেন। আমার ক্ষত বিক্ষত দেহকে তিনি প্লাষ্টিক সার্জারীর সাহায্যে নতুন ভাবে গড়ে তুললেন। আমার বাঁচবার সম্ভাবনা ছিল না, তাঁর সাহায্যে যখন বেঁচে গেলাম তখন তাঁকে আমি এক অদ্ভুত অনুরোধ জানালাম। আমার বয়স তখন বাইশ বছর। উচ্চতায় আমি ছ' ফিট। নাচে আমি পার্টনার পেতাম না এই দীর্ঘতার জন্য। ডাঃ পাশাকে বললাম—আপনার হাতে যখন এত যাদু তখন অনুগ্রহ করে আমাকে কিছু বেঁটে করে দিন। ডাঃ পাশা আমার দু'দিকের উরু অস্থির দু'ইঞ্চি হাড় নিখুঁত ভাবে কেটে দিয়ে আমাকে পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি করে দিলেন। ডাঃ পাশার প্রেমে পড়ে গেলাম। তাঁর চুম্বক ব্যক্তিত্ব, আমাকে তাঁর সঙ্গে টেনে নিয়ে চলল, ভিয়েনা থেকে তাঁর বাড়ী বোষ্টনে। তিনি তখন আমেরিকার নাগরিক। ডাঃ পাশার সঙ্গে আমি দীর্ঘ ছ-সাত বছর একসঙ্গে রয়েছি, কিন্তু আজও আমি তাঁর একজন গার্লফ্রেন্ড মাত্র। প্রেয়সীর বেশী আর কিছুই নই। তিনি আমাকে আজও বিয়ে করেন নি।

বেয়ারা ততক্ষণে প্রণবের নির্দেশে দু-কাপ কফি এনেছে। মেমসাহেব একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

চোখের কোণ বুঝি জলে চিক চিক করছিল, গলার স্বরটা ভারি হয়ে উঠেছে। তারপর কি হল মিস থিয়ার? প্রণবের কথার উত্তরে মেমসাহেব বলতে থাকেন—গত ছ মাস ধরে ডাঃ পাশা কিরকম যেন অন্যমনস্ক ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সাবলীল ভঙ্গী স্বতঃস্ফূর্ত গতি যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়েছিল। জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন—দূরের পৃথিবী আমায় ডাকছে। তোমার নামে আমি বোষ্টনে আমার সব সম্পত্তি লিখে বেরিয়ে পড়ব। এসব কথায় বিপদের গন্ধ পেয়ে আমি আতঙ্কিত হতাম।

প্রণব এক সময়ে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল— কিন্তু মিস, ডাঃ পাশা যে ইজিপ্টের লোক তার প্রমাণ কি আপনি পেয়েছিলেন? একটু থেমে লুইসা উত্তর দিলেন—আমি আমেরিকার সুইডিস এমব্যাসি থেকে খবর নিয়ে জেনেছিলাম, কায়রো ইউনিভার্সিটিতে ডাঃ পাশা কাজ করতেন। মমিদের ঘেঁটে ঘেঁটে তিনি কয়েকটা প্রাচীন রোগের কথা তাঁর থিসিসে লিখে সেখান থেকে ডক্টরেট পেয়েছিলেন। হ্যাঁ, তারপর যা বলছিলাম। কফির কাপটা শেষ করে লুইসা

টেবিলের ওপর রাখলেন। ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে মুখ ও চোখের কোণটা মুছে বলতে লাগলেন এক মাসের বেশী হল ডাঃ পাশা আমেরিকা ছেড়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছেন। আমি তন্ন তন্ন করে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সুইডিস্ এমব্যাসির মারফৎ তাঁর ফটো দেখিয়ে সন্ধান করছি। অবশেষে তারা আমাকে জানায়, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে এই চেহারার একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। খুঁজতে খুঁজতে তাই এই নার্সিংহোমে এসেছি।

ওহ্! ডাঃ পাশা ইজ এ ডেভিল জিনিয়াস। তিনি আমাকে নিয়ে শুধু খেলা করেছেন। এক্সপেরিমেন্ট করেছেন, কখনও ভালবাসেন নি। আচ্ছা ওই ডক্টর কুশারির কোন ফটো আপনার কাছে আছে কি?

মেমসাহেবের চোখে চোখ রেখে কিছুক্ষণ প্রণব কি যেন চিন্তা করল। ডাঃ কুশারির শেষ সতর্কবাণী তার মনে পড়ল। চেয়ার ছেড়ে উঠে পেছনের আলমারি থেকে একটা পুরনো এ্যালবাম প্রণব বের করে আনল। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে পোস্টগ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউটের পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে সে ও ডাঃ কুশারি পরপর কয়েকটা ফটো তুলেছিলেন। ইয়েস্,ইয়েস্, হিয়ার ইজ ডাঃ পাশা। উত্তেজনায় মেমসাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন। তারপরই যেন একটা বিস্ফোরণের ঝাপট তার চোখে মুখে আছড়ে পড়ল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগলেন—কিন্তু আপনার বয়েস তো অনেক কম লাগছে। এটা কত বছর আগেকার ফটো? আবার মেমসাহেবের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কাটা কাটা ভাষায় প্রণব বলতে থাকল—এটা পঁচিশ বছর আগেকার তোলা ফটো। ডাঃ কুশারির বয়স তখন ছিল পঁয়ত্রিশ আর আমার পঁচিশ।

—ওহ্, নো……ওহ্ নো। লুইসার আশার স্ফুলিংগটা যেন দপ করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল। ডাঃ পাশার বয়স এখন পঁয়ত্রিশ আর আমার ত্রিশ। এ হয় না, হতে পারে না। বাট স্ট্রেনজ্। সেই এক চেহারা। মুখ চোখের সেই একই ভঙ্গী। কোন তফাৎ নেই। ওহ্ গড! পুরুষ জাতটা কি প্রতারক। মেয়েদের জীবন, যৌবন, ভালবাসা নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলে। গুডবাই, বলে কান্নার ঝড় তুলে লুইসা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আর বেদনাহত বিস্ময়ে চিত্রার্পিতের মত প্রণব চেয়ারে বসে থাকে।

[পাঁচ]

চাল্লিশ বছর পরে আর এক সোনালি রোদ ঝরান প্রভাত। দিল্লীতে তখন দুর্জয় শীতের পালা চলছে। ডিসেম্বর মাসের হাড় কাঁপানো শীত। কনটপ্লেসের একটা হোটেলের লাউঞ্জে বসেছিল ডাঃ প্রণব মুখাজী। নব্বই বছরের বৃদ্ধের দেহে জরা ছোবল বসিয়েছে। চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে। মাথার মাঝখানে টাক। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা। ছানি অপারেশন করে চোখের ভেতরে লেন্স বসিয়ে নিয়েছেন, চশমা পরেন না।

ঘরটা সেণ্ট্রাল হিটেড ছিল। ডাঃ প্রণব মুখাজী এখন সারা ভারতবর্ষে অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ঠ নিউরো সার্জেন। মস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি প্রায়ই দেশে ও বিদেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। শল্যায়ন বিশেষ করেন না। তাঁর তৈরী ছাত্ররাই এখন নামজাদা মস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞ। অবসর নিতে চাইলেও তাঁর ছাত্র ও সহকর্মী চিকিৎসকরা তাকে অবসর নিতে দেন নি। এমেরিটাস অধ্যাপক হিসাবে তিনি এখনও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহাল রয়েছেন। বয়সের ভারে শরীর নুব্জ হয়ে গেলেও তাঁর চেহারায় কিন্তু ক্লান্তির ছাপ নেই। সেবার দিল্লীতে আন্তর্জাতিক নিউরোলজিক্যাল কনফারেন্স বসেছে। দেশ বিদেশ থেকে বহু খ্যাতনামা মস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞ ও সাংবাদিকরা এসেছেন। দিল্লীর বিখ্যাত তালকোটরা স্টেডিয়াম অধিবেশন চলছে। এক এক দেশের বিশিষ্ট নিউরো সার্জেনরা তাদের নবলব্ধ গবেষণা সম্পর্কে প্রাজ্ঞ মতামত রাখছেন। সেদিন ইটালির এক তরুণ নিউরো সার্জেন ডাঃ হেনরী গ্যালিয়াত্তির বক্তৃতা দেবার কথা। তাঁর নবলব্ধ গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। মঞ্চের ওপর উঠে এলেন মধ্য তিরিশের একজন সুশ্রী যুবা পুরুষ। তার চোখের, চুলের রং কালো। গায়ের রং হলদেটে সাদা, পরনে ইটালিয়ান কাটের নেভি ব্লু রং-এর স্যুট। পায়ে ইটালিয়ান গড়নের ছুঁচলো জুতো। তার সঙ্গে এসে দাঁড়ালেন তাঁরই সহকর্মী ইটালিয়ান ইহুদী চিকিৎসক সিনোরিটা বার্ণা। ডাঃ গ্যালিয়াত্তি বললেন, আমরা এখন

যেমন প্রয়োজনে মানুষের হৃৎপিণ্ড, কিডনী, যকৃত, কর্নিয়া বদলে আর একজনের লাগিয়ে দিচ্ছি ; ঠিক সে রকম ভাবে একদিন সদ্য মৃত মানুষের মস্তিষ্ক অন্য একজন রোগাক্রান্ত দেহের মস্তিষ্কে লাগান সম্ভব হবে। অবশ্য এর পরিণাম খুব আনন্দ জনক নয়। কারণ আপনারা জানেন মস্তিষ্কের ভেতরে কোষগুলোতে আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চিন্তা ভাবনা, ক্ষুধা নিদ্রার সব কিছুর কেন্দ্র থাকে। তাই একজনের মস্তিষ্ক বদলে আর একজনের মস্তিষ্ক দিলে, সেই রোগাক্রান্ত মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হলেও, সুস্থ মস্তিষ্কের চিন্তা ধারা অন্যের দেহ মনকে পরিচালিত করবে।

এই বলে তিনি তাঁর একটা এক্সপেরিমেন্টের ভিডিও ফটো দেখাতে লাগলেন। তাঁর ইহুদী বান্ধবী কুমারী বার্ণা তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে থাকলেন। সবিস্ময়ে দর্শকরা প্রত্যক্ষ করলেন রোগাক্রান্ত বাঁদরটা ডান হাত দিয়ে কলা খাচ্ছে। তার মস্তিষ্ক বদলের পর সে বাঁ হাত দিয়ে সব কিছু কাজকর্ম করতে লাগল। এ প্রসঙ্গে ডাঃ গ্যালিয়ত্তি বললেন—আপনারা জানেন, আমাদের ডান হাত ও পায়ের কর্মকেন্দ্র মস্তিষ্কের বাঁ দিকে থাকে, আর বাম অংশের থাকে মস্তিষ্কের ডান দিকে। এই বাঁদরটা আজও বেঁচে আছে, কিন্তু তার চিন্তাধারা কর্ম পদ্ধতি, আচার ব্যবহার সব পালটে গেছে। সুস্থ বাঁদরটার মস্তিষ্ক এখন নবলব্ধ দেহ আশ্রয় করে নতুন জীবন শুরু করেছে।

সভায় উপস্থিত বিজ্ঞানী দর্শকরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁরা একে একে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন এর প্রতিকার কি ? তখন ডাঃ গ্যালিয়ত্তির নির্দেশে সিনোরিটা বার্ণা একটা মস্তিষ্কের মডেল হাতে তুলে ধরলেন। ডাঃ গ্যালিয়ত্তি বলতে থাকেন—একটা মটর গাড়ির ইঞ্জিন বা ব্যাটারির অন্য কোন অংশ নষ্ট হয়ে গেলে যেমন আমরা নতুন ইঞ্জিন বা অনুরূপ অংশ লাগিয়ে দিয়ে গাড়িটাকে নতুনভাবে চালু করতে পারি, ঠিক সেভাবে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঙ্গ, বিভিন্ন কেন্দ্রের অংশগুলোকে আমরা বাদ দিয়ে সুস্থ মস্তিষ্কের অংশ সেখানে সংযোজন করলে, এই জটিলতার হাত থেকে মুক্ত হতে পারি।

ডাঃ গ্যালিয়ত্তির ঝটিকা বক্তৃতা ও বিস্ময়কর শল্য গবেষণার বিবরণ শুনে ও ভিসিআর-এ সেগুলো প্রত্যক্ষ করে, দিল্লীর তালকোটরা স্টেডিয়ামের উপস্থিত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। এর পরে কনফারেন্সের

চেয়ারম্যান প্রাজ্ঞ, অতি বৃদ্ধ ডাঃ প্রণব মুখার্জী মাইকের সামনে বলতে লাগল, আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতা ভরা দীর্ঘ জীবনের গোড়ার দিকে এই তরুণ ইটালিয়ান ডাঃ গ্যালিয়ত্তির মত একজন ভারতীয় ডাক্তারের সাহচর্য্য পেয়েছিলাম। এক্সপেরিমেন্টই ছিল যাঁর জীবনের নেশা। আজ থেকে প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আগে, তাঁর এক শল্যায়নে আমি সহায়তা করেছিলাম। তিনি এক বৃদ্ধ, মুমূর্ষু কুকুরের মস্তিষ্কে পিটিউটারি গ্রন্থি তুলে সেখানে এক জোয়ান কুকুরের পিটিউটারি বসিয়ে দিয়েছিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার···বারো ঘণ্টা বাদে সেই বৃদ্ধ কুকুরটা একটা জোয়ান তেজী কুকুরে রূপান্তরিত হয়েছিল। এটা আমার স্বচক্ষে দেখা। অবশ্য ডাঃ গ্যালিয়ত্তির বাঁদরের মস্তিষ্ক বদল তার চেয়ে আরও বিস্ময়কর, আরো দুরূহ শল্যায়ন। উপস্থিত শ্রোতারা করতালি দিয়ে এই সব জটিল শল্য গবেষণাগুলোর প্রশংসা জানালেন।

দিল্লীর কনট্ প্লেসের হোটেলের স্যুইটটা ডাঃ প্রণব মুখার্জীর জন্য কর্তৃপক্ষ ভাড়া নিয়েছিলেন। তিনি একাই স্যুইটে এসে উঠেছিলেন। তাঁর বিশ্বস্ত ড্রাইভার বাহাদুর তার সঙ্গে এসেছিল। প্রণবকে পেঁছে দিয়ে বাহাদুর গাড়ি নিয়ে দিল্লীর রাজপথে ঘুরতে চলে গেল।

বেল বাজিয়ে হোটেল বয়কে দিয়ে রাতের ডিনারটা ঘরে আনিয়ে, নিঃশব্দে নিরালায় ডাঃ মুখার্জী নৈশ আহার সেরে নিলেন। তাঁর স্ত্রী বছর দশেক আগে মারা গেছেন। ছেলে অনির্বাণ মেডিক্যেল কলেজের ডাক্তার। সস্ত্রীক, সপুত্র কলকাতায় থাকে। তিনি একা একা দেশে বিদেশে বক্তৃতা দিয়ে ঘুরে বেড়ান। বয়সের ভারে তিনি আজ বড় ক্লান্ত। বড় একা।

বেয়ারারা এসে প্লেটগুলো নিয়ে চলে গেছে। কাল সকালের প্লেনে তিনি কলকাতা ফিরবেন। কব্জি ঘুরিয়ে হাত ঘড়িতে দেখলেন রাত এগারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী আছে। হঠাৎ দরজায় কলিং বেল বাজতেই তিনি ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে বাইরের দরজাটা খুললেন। আশ্চর্য! কে বেল বাজাল? দরজার বাইরে কেউ নেই। চোখের ঘোলাটে দৃষ্টির সাহায্যে এবার উপরের সিঁড়ির ফ্লাইটে কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন; ডাঃ গ্যালিয়ত্তি! অস্ফুটভাবে প্রণব উচ্চারণ করল। ঝড়ের বেগে সিঁড়ি দিয়ে গ্যালিয়ত্তি নিচে

নেমে এলেন। তারপর প্রণবের হাত ধরে, এক ঝটকায় তাঁকে স্যুইটের মধ্যে ঢুকিয়ে বাইরের দরজা ভেতর থেকে অর্গলবন্ধ করলেন। চোখের হালকা চশমাটা খুলে নিয়ে পরিষ্কার বাংলায় সপ্রতিভ হেসে ডাঃ গ্যালিয়ত্তি বললেন, —এবার আমাকে চিনতে পারছ প্রণব···

কে···? ভয়ার্ত, বিস্মিত কণ্ঠে বৃদ্ধ প্রণব চেঁচিয়ে উঠল, কুশলদা তুমি ? না···না···এ অসম্ভব ! ···হতে পারে না !

আজ আমার বয়স নব্বই। ডাঃ কুশল কুশারি বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স আজ হত একশো বছর। আর ডাঃ গ্যালিয়ত্তি— আপনার বয়স পঁয়ত্রিশের বেশী কিছুতেই নয়।

ম্লান হেসে আগন্তুক বলেন, আমি ডাঃ কুশল কুশারি। ক্যালেণ্ডারের হিসাব অনুযায়ী আমার বয়স এখন একশো বছর হলেও, বিজ্ঞানের আশীর্ব্বাদে আমি আজ পঁয়ত্রিশ বছরের যুবা।

কুশল বলে চললেন, প্রণব, তুমি চল্লিশ বছর আগে আমার পিটুইটারির উপর যে অস্ত্রোপচার করেছিলে তার প্রভাবে আমার বয়স আর বাড়েনি; কিন্তু সেই শল্যায়নের প্রভাব এখন শেষ হয়ে এসেছে। আমি বলেছিলাম প্রয়োজনে আমি তোমায় ঠিক খুঁজে নেব। আজকের রাত শেষ হলেই, আমার যৌবনের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে। আমি একশো বছরের বৃদ্ধতে রূপান্তরিত হয়ে যাব। তাই এত রাত্তিরে তৈরী হয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

ডাইনিং টেবিলের কাছে এসে ডাঃ কুশারি তাঁর চামড়ার জ্যাকেটটা খুলে ফেললেন। জ্যাকেটের ভেতর থেকে একটা পলিথিন গ্লাস ফাইবারের ছোট বাক্স বেরিয়ে এল, সেটা খুলে তার ভেতর থেকে একটা যন্ত্রগণক বার করে তিনি বললেন, এটা নতুন মডেলের ইলেকট্রোনাইজড্ কম্পিউটার। এর সঙ্গে লেসার রশ্মির ব্যবস্থা আছে। এখন শল্যায়ন অনেক সোজা হয়ে গেছে।

রাডারের পর্দায় দেখে, এ্যাম্পিউলটা রক্ত জালির ভেতর এই শলাকার সাহায্যে ইনজেক্ট্ করে দেবে। তারপর লেসার রশ্মির সাহায্যে উপর থেকে, রাডারের পর্দায় ছায়া দেখে ক্যারোটিড, ধমনী, বক্ষ, ধমনী ও পৈটিক ধমনী-গুলোর ওপর লাইন বরাবর বুলিয়ে দেবে। বয়সের ভারে ধমনী ও রক্ত জালিকাগুলির যে আবর্টোরিও স্কেলেরোটিক পরিবর্তন হয়েছে সেগুলো বদলে নব যৌবনের পর্যায় চলে আসবে।

অজ্ঞান করার জন্য গ্যাস বা ইথার-এর প্রয়োজন হবে না। আমি অজ্ঞান বটিকা খেয়ে নিচ্ছি। এর প্রভাবে এক ঘণ্টা আমি অজ্ঞান হয়ে থাকব। পুরো অপারেশনটা করতে আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগবে না।

ডাঃ প্রণব মুখার্জী মন্ত্রমুগ্ধের মত সব শুনছিল ও অপারেশনে তালিম নিচ্ছিল। বড়ি খেয়ে ডাঃ কুশারি ডাইনিং টেবিলের ওপর অজ্ঞান হয়ে সটান শুয়ে পড়েছেন। গ্লাভস্ পরে বাঁকানো শলাকটা হাতে নিয়ে নাকের ভেতর ঢুকিয়ে, ফুটো করে, সোজা পিটিউটারির কাছে পেঁছে গেল। রাডারের পর্দায় পিটিউটারি রক্তজালিকাগুলো প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল। এ্যাম্পিউলটা ভেঙ্গে নির্যাসটা পিটিউটারিতে পেঁছে দিলেই ডাঃ কুশারির পঁয়ত্রিশ বছরের যৌবন হয়তো আরো একশো বছর অটুট থাকবে।

প্রণবের মাথায় হঠাৎ যেন ইলেকট্রিক শক লাগল। সে কতবড় অন্যায় করতে যাচ্ছে, তার আয়ু হয়তো আর কয়েক মাস বা দু-এক বছর; কিন্তু ডেভিল জিনিয়াস ডাঃ কুশারি তাঁর অনন্ত যৌবন নিয়ে আরো বহু নারীর সর্বনাশ করবেন। মায়াবী…লুইসাথিয়ার ডেল…সর্বশেষ ইহুদী তরুণী ডাঃ বার্ণা। মানবজাতির কি লাভ হয়েছে ডাঃ কুশারির এই জরাজয়ের আবিষ্কারে? হাতের এ্যাম্পিউলটা নিচের দিকে প্রণব ছুঁড়ে ফেলে দেয়। শলাকাটা নাক থেকে বার করে নেয়, কম্পিউটারের অসহিষ্ণু আলোগুলো দপদপ করতে থাকে। এই ব্যতিক্রমে সে যেন বিভ্রান্ত। সব যন্ত্রপাতি পলিথিনের ব্যাগে ভরে, সেটা বন্ধ করে দেয়, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে আরামে চেয়ারে বসে প্রণব টানতে থাকে।

ঢং ঢং করে ওয়ালক্লকে রাত বারটার ঘণ্টা বাজতে থাকে। ঘড়ির শেষ ঘণ্টাটা পড়তেই ডাঃ কুশারি চোখ খোলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আহঃ করে আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়েন। সামনে প্রণবকে দেখে হাসিমুখ বলেন, আর একটা সফল শল্যায়ন। তোমায় ধন্যবাদ প্রণব। তুমি আমার উপযুক্ত ছাত্র। আরও একশো বছর ধরে আমি যৌবন ভোগ করব।

প্রণব তৈরী হয়েছিল তার এ্যালবাম থেকে যে কয়েকটা ফটো কুশলকে দেখানোর জন্য। তার আর কুশলের ফটো কলকাতায় তোলা। তার বয়স তখন পঁচিশ আর কুশারির পঁয়ত্রিশ।

ডাঃ কুশারি এবার বলেন, দাঁড়াও. অপারেশন ব্যাগটা একবার পরীক্ষা করে নিই। পিটিউটারি নির্যাস কতটা লেগেছে। ব্যাগটা খুলেই ডাঃ কুশারি তীব্রস্বরে আর্তনাদ করে ওঠেন। একি! আমার পিটিউটারিতে যে কোন নির্যাসই যায়নি। লেজার রশ্মির ব্যবহারই হয়নি। তার মানে···তুমি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছ প্রণব। তোমাকে আমি শেষ করে দেব। শানিত শলাকাটা ডান হাতে বজ্রমুষ্টিতে তুলে প্রণবের দিকে এগিয়ে যান ডাঃ গ্যালিয়াত্তি ওরফে ডাঃ কুশল কুশারি। তারপরই একটা অমানুষিক চিৎকার করে তিনি টেবিলের ওপর লুটিয়ে পড়েন। তার যৌবনের মেয়াদ তখন শেষ হয়ে গেছে। পঁয়ত্রিশ বছরের যুবক ডাঃ গ্যালিয়াত্তি, তখন একশো বছরের বৃদ্ধ ডাঃ কুশল কুশারিতে রূপান্তরিত হয়েছেন। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে ডাঃ প্রণব মুখার্জী বৃদ্ধ কুশলদার এই মরণ যন্ত্রণা নিঃশব্দে প্রত্যক্ষ করতে লাগল।
